



নন্দরানির মুক্তিযুদ্ধ

বাসুদেব ধর

নন্দরানির সংসারে সদস্য বাড়লো। রাতভর বৃষ্টি ছিল, ভোরের
দিকে ধরে আসে। কিন্তু আকাশে এখনো মেঘের রাজত্ব।
অন্ধকার সরিয়ে আলো ছড়াতে সূর্য যেন যুদ্ধ করছে। ঘুম ভাঙতে
দেরি হয়ে গেছে নন্দর। দোর খুলেই দেখে বারান্দায় শেফালি বসে
আছে, দেয়ালে হেলান দিয়ে। নন্দর আগমন টের পায়নি।

উঠোনে জল জমেছে। বৃষ্টি হলেই জল জমে। সরতে সময় নেয়। সারারাত বৃষ্টি হয়েছে, আজ বেশ ভোগাবে মনে হচ্ছে। নন্দ শেফালির কাছে এসে দাঁড়ায়, কীরে আমায় ডাকিসনি কেন? অনেক বেলা হয়ে গেল যে!

শেফালি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই কোলে কুকুরের বাচ্চাটা চোখে পড়লো। শেফালি বলে, তুমি ঘুমাচ্ছিলে মাসি, তাই ডাকিনি। কুকুরের বাচ্চাটা দেখো মাসি, ওই কামিনী ফুলের গাছের নীচে বসে কুঁইকুঁই করছিল। ভিজে একশা। মায়া হলো, তুলে নিয়ে এলাম। খুব সুন্দর না মাসি?

শেফালির বলার ধরন দেখে হেসে ফেলে নন্দ, আমাদের সংসারে সদস্য সংখ্যা বাড়লো মনে হচ্ছে। তোর হাতে যখন পড়েছে। এখন কাজে যা। দেরি হলে সামলাতে পারবি? স্কুল কামাই করবি না কিন্তু!

মাসির কথায় ক্ষেপে নেই শেফালির। যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, নামও একটা রেখে দিয়েছি মাসি, ডগি। ভালো নাম না? কুকুরের বাচ্চাটা কেমন নিশ্চিন্তে শেফালির কোলে মুখ গুঁজে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে নন্দর দিকে। নন্দ লক্ষ্য করে, এরই মধ্যে শেফালির ডগি বুঝে গেছে, তাকে এ বাড়ি ছাড়তে হবে না। নন্দরও মায়া হচ্ছে, সদ্য জন্ম নেয়া বাচ্চা। কিন্তু কীভাবে বাড়ির আঙ্গিনায় এল বোঝা যাচ্ছে না। একটা আশঙ্কাও হচ্ছে, আশপাশে নিশ্চয়ই আরও বাচ্চা-সহ মা-ও আছে। এরাও যদি ঢুকে পড়ে তাহলে সমস্যা হবে।

শেফালির ভেতর চলে যাওয়া দেখলো নন্দ। মেয়েটা বড্ড মমতাময়ী। এই শেফালিকেও কুড়িয়ে পেয়েছিল নন্দ। স্থানীয় কালীমন্দিরের পুরোহিত কমলাকান্ত চক্রবর্তী, নন্দ যাকে ঠাকুরদা ডাকে, এক সকালে ডেকে পাঠায় নন্দকে। মন্দিরে ছুটে গেলে কমলাকান্ত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। কোলে এক শিশু, প্রচণ্ড কান্নাকাটি করছিল। সদ্যোজাত বাচ্চা, কিছুতেই থামাতে পারছেন না কমলাকান্ত। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই নন্দর কোলে শিশুটিকে তুলে দেন, আমাকে তুই বাঁচা নন্দ। তুই ওকে নিয়ে যা।

কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে নন্দ। আর আশ্চর্য, নন্দর কোলে এরই মধ্যে চুপ হয়ে গেছে শিশুটি। এখনো গায়ে সদ্য জন্মের রক্তের দাগ। জন্মের পর ভালো করে পরিষ্কার করা হয়নি।

দেখছি, তাকে চিনে ফেলেছে এরই মধ্যে। আমি বাঁচলাম বাবা। সকালে মন্দির খুলতে এসে দেখি, বারান্দায় কাঁথায় জড়ানো শিশুটা কাঁদছে। এক সর্বোনাশার কাজ। সম্ভবত কিছুক্ষণ আগেই কেউ রেখে গেছে। ভাগ্যিস কুকুর-বেড়াল এসে পড়েনি। আমি তো ফেলে রাখতে পারি না। কোলে তুলে নিলাম, পূজা আমার মাথায় উঠলো। কোথায় ফুল তোলা, কোথায় জোগাড় যন্ত্র। এখন যা, আমি চানটান করে পূজার

কাজ করি। ওবেলায় গিয়ে দেখে আসবো।

এর মধ্যে নন্দ একটা কথা বলারও সুযোগ পায়নি। সবকিছু কেমন জানি গুলিয়ে যাচ্ছে। একবার ঠাকুরদা একবার শিশুটির দিকে তাকায়। পাড়ার অনেকে ছুটে এসেছে খবর পেয়ে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না নন্দ। শিশুটি নন্দর বুকে মুখ গুঁজে আবার কান্না শুরু করেছে। খিদে পেয়েছে সম্ভবত।

কমলাকান্ত আবার কাছে এসে দাঁড়ান। নন্দর মাথায় হাত রাখেন। বলেন, তুই তো ছেলে-মেয়ের মা হতে পারলি না। আমার মা কালী ওকে তোর কাছেই পাঠিয়েছেন। আজ থেকে তুই-ই ওর মা। এখন যা। আমি পূজায় বসবো। অনেক কাজ পড়ে আছে।

নিঃশব্দে কিছু সময় গড়িয়ে যায়। নন্দ কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না। এক সময় বলে, ঠাকুরদা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এ আমার কাছে থাকবে, গ্রামের মানুষ কী বলবে। পরে এ নিয়ে বুটঝামেলা হলে আমি কী করবো? আমার ভয় হচ্ছে।

কোনো ভয় নেই। আমি ওবেলা থানায় গিয়ে পুরো বিষয়টি জানিয়ে আসবো। তুই এখন যা, শিশুটিকে কিছু খাওয়া। ওকে বাঁচ। বুঝতেই তো পারছিস, কোনো পাষাণের কাজ। তোর ঘরে দুধটুপ নিশ্চয়ই আছে। তোর কোনো কষ্ট হবে না। দ্যাখ, শিশুটি আশ্রয় না পেলে মারা যাবে। ও তো কোনো পাপ করেনি নন্দ, ঠাকুরদা অভয় দেন। উপস্থিত সবাই কমলাকান্তকে সমর্থন করেন।

* * * * *

সেই তেরো-চোদ্দ বছর আগের ঘটনা। সেদিনের ঘটনা স্বপ্ন মনে হয়। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে নন্দকে। একদিকে দোকানপাট সামলানো, অন্যদিকে শিশুটিকে মায়ের যত্নে বড়ো করা। অনেকটা যুদ্ধের মতো। ঠাকুরদা পাশে ছিলেন, নানাভাবে সহায়তাও করেছেন। কিছুদিনের মধ্যে নন্দ বুঝতে পারে, এই শিশু তাকে অনেক কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। তারও মা হওয়ার একটা সুপ্ত বাসনা ছিল। শেফালি সেই বাসনা পূরণ করেছে। এখন শেফালি বড়ো হয়ে গেছে। নন্দই আসল মা, যদিও মাসি ডাকে। নামটা রেখেছেন ঠাকুরদা। বলেন, শেফালিফুল আমার মায়ের পূজোয় দিই। মায়ের মন্দিরে ওকে পেলাম। ওর নাম শেফালিই থাকুক।

শেফালি সকাল থেকে নন্দর সঙ্গে কাজ করে হোটেলে। এগারোটা বাজতেই স্কুলে যায়। বিকেলে ফিরে আবার হোটেলে থাকে, খদ্দের সামলাতে নন্দকে সাহায্য করে। সন্ধ্যার পর শেফালিকে কোনো কাজ করতে দেয় না নন্দ, পড়তে বসিয়ে দেয়। ভাবে, লেখাপড়াটা আপাতত চালিয়ে যাক, তারপর একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্কুলে ভর্তি করার পর নন্দ নিজেই নিয়ে যেত। আবার ছুটির পর নিয়ে আসতো। স্কুল কাছেই। প্রথম দিকে হোটেল আর স্কুলের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ করতে হতো। ভাগ্য ভালো স্কুল খুব দূরে নয়।

অতীত মাঝেমাঝে সামনে চলে আসে নন্দর। তখন আনমনা হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আকাশে মেঘে মেঘে আলোর আভা ফুটছে। তবে লক্ষণ দেখে মনে হয়, এত তাড়াতাড়ি সূর্যের দেখা মিলবে না। ভোরবেলাটা খুবই প্রিয় নন্দর। কিন্তু ভোর দেখা হয় না কখনো। একটু বেলা হলে ফুরসতই মেলে না। অন্যদিকে রাত আটটা-নটার আগে বিশ্রাম নেই। দুপুরে শুধু একটু গড়িয়ে নেয়। আজ অবশ্য একটু বেলা হলে আপত্তি নেই। বৃষ্টি-বাদলার দিনে, এত তাড়াতাড়ি খন্দের আসবে না। তাছাড়া দুলাল হোটেলেরি থাকে। ভোরে উঠে ঝাঁটা দেয়, জল ছিটায়, ধুপধুনো দেয়। তারপর উনুন জ্বালায়। ময়দা মাখতে বসে। এই উনুন নেভে রাতে। সকালে জলখাবার, দুপুরে ভাত, বিকেলে পুরি-সিঙ্গারা। চা সারাদিনই।

হোটেল শুরুর প্রথম ধাক্কাটা সামলায় দুলাল।

॥ দুই ॥

নন্দর সংসার ছোটো নয়। দুলাল ছাড়াও নন্দর হোটেলে কাজ করে নাসির। নাসির অবশ্য হোটেলে থাকে না, পাশের গাঁয়ে বিধবা মায়ের সঙ্গে থাকে। ভোরে চলে আসে, সন্ধ্যার পর ফিরে যায় মায়ের কাছে। নাসিরের মা সুফিয়া বেওয়া বলেন, নাসির আসলে নন্দরই ছেলে। দুলালের জন্ম রাস্তার ওধারে দাশপাড়ায়। জন্মের পরপরই মা মারা যায়। বাবা আরেকটা বিয়ে করে। নতুন সংসারে জায়গা হয়নি ছোট্ট শিশুর। মা ছিল নন্দর সই। ছোট শিশু দুলালকে ফেলতে পারেনি নন্দ। কোলে তুলে নেয়। সেই থেকে নন্দর কাছেই থাকে। নাসির ও দুলাল প্রায় সমবয়সি। ১৫/১৬ বছর বা আশপাশে।

নন্দর বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেক হেঁটে ডানদিকে পাকা রাস্তায় উঠলেই মোড়ের মাথায় হোটেল। নন্দর সংসারে একটা বেড়ালও আছে, নন্দর পিছু পিছু হোটেলে আসে, আবার রাতে হোটেল থেকে বাড়ি ফিরে যায়। নন্দর ঘরে থাকে। রাস্তার মোড়ে মাত্র কয়েকটা দোকান ছিল, স্টেশনারি, মুদি, জামা-কাপড়, জুতা, ওষুধ, বেকারি আর মিষ্টির দোকান। এছাড়া রয়েছে স্থায়ী কয়েকটা সবজির দোকান, রেডিয়ো-টেলিভিশন মেরামত, বিকাশ-ফ্লেক্সির দোকান ইত্যাদি। একটা চায়ের দোকান হয়েছিল, কয়েক মাসের মধ্যে উঠে যায়। নন্দর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারেনি। এই মোড়ে এখন বহু দোকানপাট। ব্যস্ত এলাকায় পরিণত হয়েছে। নন্দ প্রথমে ভেবেছিল চায়ের দোকান দেবে, কিন্তু ধীরে ধীরে কীভাবে চায়ের দোকান থেকে হোটেলে পরিণত হয়ে গেল মনে পড়ছে না। তবে এটা ঠিক

খন্দেররাই এটাকে হোটেলে পরিণত করেছে।

নন্দর দোকানের চা, পরোটা-সবজি, ডিম-পরোটা আর পুরি-সিঙ্গারার স্বাদই আলাদা। দুপুরে ভাত, মাছ, মুরগি। ডাল, তরকারি। সব রান্নাই নিজের হাতে করে নন্দ। চা মাঝে-মাঝে নিজের হাতে বানায়। অন্য সব দুলাল-নাসির মিলে। এরই মধ্যে ওরা পাকা হয়ে উঠেছে, বয়স কাজে বাধা হয়নি। শেফালি সকালে ও সন্ধ্যায় যতক্ষণ দোকানে থাকে পয়সাকাড়ি সামলায়, হিসাবপত্র ঠিক রাখে। এরই মধ্যে পাকা হিসাবি হয়ে গেছে। নন্দ মুগ্ধ হয়ে দেখে, সুন্দর হাতের লেখায় হিসেব সাজানো। নন্দ এত লেখাপড়া শেখেনি, তবে প্রায় তিন দশক হোটেল চালিয়ে অনেক কিছু শিখেছে। অনেকেই বলেন, নন্দ পাক্ষা ব্যবসায়ী।

এই মোড়টার একটা নাম আছে। মুক্তি মোড়। এখানে তিন খানসেনা খতম হয়েছিল একান্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। কে নামকরণ করেছিল জানা নেই, কিন্তু এখন এই নামই প্রতিষ্ঠিত। এখান থেকে সদর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। বাস চলাচল করে এই রাস্তা দিয়ে। গ্রামের সবাই এখান দিয়েই যাতায়াত করে। রিকশা আছে, টেম্পো আছে। মোটামুটি জমজমাট গোটা এলাকা। বিদ্যুৎ আসায় গুরুত্ব আরও বেড়েছে। যদিও বিদ্যুৎ থাকে আসা-যাওয়ার মধ্যেই। সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে মানুষের। তবে এখানে জেনারেটরের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে বিদ্যুতের অভাবটা সেভাবে কেউ অনুভব করে না।

নন্দ সবকিছু গুছিয়ে হোটেলে চলে আসে আধঘণ্টার মধ্যেই। শেফালি আগেই এসে গেছে। কুকুরের বাচ্চাটাকেও নিয়ে এসেছে। বুধের মা সকাল-বিকাল দোকানে এসে ধোয়ামোছার কাজ সেরে জলখাবার খেয়ে চলে যায়। আজ এখনো আসেনি। হয়তো বৃষ্টির কারণে, বুধের মায়ের তেমন কামাই হয় না। এখানে এসে শুধু কাজ নয়, নন্দর সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্পও করে। বলে, নন্দদি আমার সঙ্গে তো কেউ কথা কয় না। শুধু কাজের ভুল ধরে। তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে শান্তি পাই। আসলে আমাদের তো কেউ মানুষ মনে করে না।

দুলাল ময়দা মাখছে, নাসির সবজি তৈরি করছে। জোগাড় যন্ত্র করতে নন্দ এসে পড়ে। নন্দই বাকিটা করে। অন্যদিন এতক্ষণ খন্দের আসতে শুরু করে, আজ এখনো হোটেল ফাঁকা। অন্য দোকানগুলো খোলে দেরিতে, মুদির দোকান সকালেই। শেফালি এসেই চায়ের কেটলি চাপায়। বুধের মায়ের আসতে দেরি হলে কাপ-ডিশ ধোয়া-মোছা করে। খন্দের আসার আগেই নন্দ সবাইকে নিয়ে চা খায়। সে চা তৈরি করে শেফালি। তার আগে বেড়ালটার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে। আজ খাবার দুজনের জন্য। নতুন অতিথিকে অবশ্য দূরে রেখেছে। জানে, এখনো দুজনকে পাশাপাশি রাখা যাবে না। নন্দ চা খাচ্ছে বিস্কুট দিয়ে, দৃষ্টি উনুনে সবজির দিকে। আগুনের

তাতে এরই মধ্যে মুখ লাল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ নাসিরকে ডাকে, আজ বৃষ্টি-বাদলায় এত সবজি টানবে তো রে? নাসির মাথা নাড়ে, এখন তো বৃষ্টি নেই মাসি।

জলখাবারের কাজ সেরে নাসিরই বাজারে যায়, মাছ-মাংস কেনে, সবজি আনে। বাজার রাস্তার ওপারে, একটু এগিয়ে। নন্দ সবজি রান্নার পর দুপুরের খাবার তৈরি করে। ওই পর্যন্ত চা সামলায় শেফালি।

নিত্যদিনের এই জীবন, এর মধ্যেই নন্দ ডুবে থাকে। আজ হয়তো খাওয়া-পড়ার অভাব নেই, কয়েকজনের রুজিরোজগার তার ওপরেই। ভাবতে ভালো লাগে, ওরা সবাই নন্দকে আপন করে নিয়েছে, নিজের হোটেল মনে করে। সেভাবেই খাটে। নন্দও তাদের বুক দিয়ে আগলে রাখে। এই অবস্থায় আসতে নন্দকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। সেইসব দিনের কথা ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়, তাই ভাবতে চায় না। ফিরতে চায় না অতীতে। এক দগদগে ঘা তাকে সমাজ ও মানুষ চিনিয়ে দিয়েছে। আজও যুদ্ধ করছে নন্দ, জানে, তার কিছু হলে ছেলে-মেয়েগুলো ভেসে যাবে। বিশেষ করে শেফালি। ছেলেদুটির হয়তো কাজ জুটে যাবে, কিন্তু শেফালি? কোথায় দাঁড়াবে সে? মাঝে মাঝে আঁতকে ওঠে নন্দ।

হঠাৎ ডাক আসে শেফালির, দুই প্লেট পরোটা-ভাজি।

সম্বৎ ফিরে পায় নন্দ, সবজির গামলাটা নিয়ে আয়, হয়ে গেছে। দুলাল পরোটা তৈরি করছে, সবাই গরম পরোটা চায়। সে গুলি পাকিয়ে রাখে, যাতে অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে বেলে ভেজে দিতে পারে। এক এক করে এখন ভিড় বাড়ছে। দোকানের ভিতরে জনা বারো বসতে পারে টেবিলে, সামনে চেয়ার-টেবিল পেতে আরও আট-দশজনের বসার ব্যবস্থা হয়েছে। এই ভিড়টা অবশ্য ঘণ্টা দুয়েকের। তারপরও খন্দের থাকে, তবে হাড্ডাহাড্ডি ভিড় নয়। দুপুরে ভাতের সময় আবার ভিড় বাড়ে। নন্দ নিজের হাতে ভাত তরকারি পাতে তুলে দেয়, অনেকটা ঘরের মতো। হোটেল চলে মাপা ভাতের হিসাবে, তবে এখানে নন্দের হাত লম্বা। সবাইকে বাড়ির মতো করে খাওয়ায়। এ জন্যই নন্দের হোটেল রেস্তোরাঁর নাম-ডাক। নামটাও নন্দ সেরকমই রেখেছে, ‘অতিথি’। আসলে সেটা ঠাকুরদা কমলাকান্তর দেয়া। সব শুনে কমলাকান্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে জিজ্ঞেস করেন, তুই মেয়েমানুষ, পারবি দোকান করতে? আরও ভেবে দ্যাখ।

আসলে নন্দের আর কোনো উপায় ছিল না। একটা কিছু করে দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কী করবে? বাড়িটা আছে, সে একা আর রাস্তার মোড়ে নিজের সামান্য জমি। এই জায়গাটা ধীরে ধীরে জমে উঠছে, সেখানে দোকানপাট হচ্ছে। দুলাল তখন ছোটো। তখনই নন্দের মাথায় চিন্তা আসে, একটা চায়ের দোকান তো করা যায় নিজের জায়গায়। নিজের হাতে

বানাবে। এখানে কোনো চায়ের দোকান নেই। সেই শুরু, অবস্থা ধীরে ধীরে পালটেছে। হোটেলের আয়তন বেড়েছে, খাবারের পদ বেড়েছে, দুপুরে ভাত মাছ। মুরগি এসেছে আরও পড়ে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকে নন্দ, খাওয়া-থাকার অভাবটা অন্তত নেই। হোটেলটা মনের মতো করে সাজিয়েছে। সবার আস্থা তৈরি হয়েছে। এটাই সান্ত্বনা। গোটা গাঁয়ের মানুষ ছাড়াও পাশের কয়েকটি গ্রাম থেকে সদরে যাতায়াত করেন এমন মানুষও এখানে ভিড় করেন। বাঁধা খন্দের হয়ে গেছে অনেকে। কেউ কেউ বলেন, নন্দের সংসারে পা না দিয়ে ভাত হজম হয় না। দোকানটাকে সবাই বলেন নন্দেরানির সংসার। ‘অতিথি’ নামটা হারিয়ে গেছে, সাইনবোর্ডটার রংটাও ফিকে হয়ে এসেছে। নতুন করে রং করানোর তাগিদ অনুভব করে না নন্দ। মনে মনে চায়, নন্দেরানির সংসার নামটাই ভালো। সবাই এটাই বলুক। মুরকির বা বলেন, যেই আসুক নন্দের সংসারে থেকে গেলেই হয়। আমরাও বুড়ো বয়সে আশ্রয় নিলে ক্ষতি নেই তো।

নন্দ হাসে, আপনারা আশীর্বাদ করেন। আমি যেন আশ্রয় দিতে পারি। নন্দ খুশি হয়। সবার ভালোবাসায় আপ্লুত হয় নন্দ। দোকানের প্রতি আস্থা দেখে ভালো লাগে। কখনো কখনো এমনও হয়, জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হয়। এই কষ্টে কেউ কিছু মনে করেন না।

এর পাশাপাশি গ্রামে কারও বাড়িতে ছোটখাটো অনুষ্ঠান হলে সব খাবার যায় ‘নন্দের সংসার’ থেকে। নন্দই রান্না করে। সেসব দিনে নন্দ সকাল সকাল দোকানে চলে আসে। খুব ভোরে উঠে পূজার কাজ সারতে হয়। বুধের মাকে আগে বলে রাখে, সেও সকাল সকাল চলে আসে। সারাদিন থাকে। নন্দের সঙ্গে গল্প করতে করতে কাজ করে।

॥ তিন ॥

তিনটা ঘর থাকলেও বড়ো ঘরটাতে রাতে নন্দ খাটে শোয় শেফালিকে নিয়ে। এই ঘরেই শেফালির পড়ার টেবিল বসেছে। নন্দ চায় তার চোখের সামনেই শেফালি পড়াশোনা করুক। রাতের খাওয়ার পাট দোকানেই চুকে যায়। বাড়ি ফিরে শেফালি পড়তে বসে। নন্দ টুকটাক কাজ সেরে শুয়ে পড়ে। সারাদিনের ক্লান্তি, বয়স তো কম নয়। ঘরে একটা টেলিভিশন আছে, কিন্তু শেফালির পড়ার ক্ষতি হওয়ার ভয়ে টেলিভিশন দেখে না। পড়া শেষ হওয়ার পর টেলিভিশন চালু করে শেফালিই। ঘণ্টাখানেকের জন্য। সিরিয়াল দেখে। নানা অনুষ্ঠান দেখে। আজ টেলিভিশন চালু করেনি শেফালি। পড়ার টেবিল থেকেই দেখতে পায় মাসি কপালের ওপর হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে রেখেছে। বাতি নিভিয়ে চুপচাপ গিয়ে মাসির পাশে শুয়ে পড়ে।

ঘরে নিঃসীম অন্ধকার। বারান্দার দিকে জানালাটা খোলা। ডানপাশে একটা জানালা আছে, সেটা রাতে খোলা হয় না। জানালার পাশেই বাগান। গুমোট গরম, ফ্যান চলছে, কিন্তু গরম দূর করতে পারছে না। গত রাতে টানা বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও গরম কমেনি। মশারির ভেতরে বাতাস যেন ঢুকতেই চায় না। তবু মশারি না টাঙিয়ে উপায় নেই, মশার আক্রমণ ঘুমের বারোটো বাজিয়ে দেয়।

শেফালি শুয়েই টের পায়, মাসি ঘুমায়নি। কয়েক রাত ধরেই এমন হচ্ছে। কী এমন ঘটেছে, যা মাসির চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েকবার এপাশ ওপাশ করে শেফালি মাসির গায়ে হাত রেখে ডাকে, মাসি, মাসি গো। তুমি তো ঘুমোচ্ছ না। নন্দ পাশ ফিরে শেফালিকে টেনে নেয়, ঘুমো।

তুমি তো কয়েক রাত ঘুমোচ্ছ না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। শেষ রাতের দিকে ঘুমোও। সেই জন্যই তো ভোরে ডাকি না। কী হয়েছে তোমার মাসি?

কিছু হয়নি। তুই ঘুমো। স্কুলের পড়াশোনা কেমন চলছে? আমি কিন্তু সব মাস্টারের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিই। তোকে তো ভালো করতে হবে মা। আমার আর কে আছে বল?

—আমি জানি মাসি। আমি তো চেষ্টা করি। কিন্তু তোমার মন খারাপ দেখলে, তোমার মুখে হাসি না দেখলে আমার খারাপ লাগে। আমি পড়াতেও মন বসাতে পারি না।

—ও মা আমার মেয়ে তো বুড়ি হয়ে উঠছে। সব ভাবতে শিখছে। ওসব ভেবে কাজ নেই। তোর কাজ পড়াশোনা। দোকানের কাজ একটু-আধটু করিস ওই যথেষ্ট। আমি না থাকলে এই দোকানতো তোরই। নন্দ টের পায়, এ কথায় কেমন জানি শেফালি কঁপে ওঠে। আরও কাছে টেনে নেয় শেফালিকে। মেয়েটা অনেক কিছু বোঝে। জানে, তাকে অনেক কিছু বুঝতে হবে। আর কোনো কথা বলে না নন্দ, মেয়েটির মাথায় হাত বোলায়, তুই ঘুমো, আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। নন্দের চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়। তাও কিন্তু টের পায় শেফালি।

নন্দ কয়েকদিন ধরে সত্যি চিন্তিত। সপ্তাহখানেক ধরে হঠাৎ লক্ষ্য করছে সেই আমজাদ চা খেতে আসছে দোকানে। প্রথমে চিনতে পারেনি। চেহারা ও পোশাকে পরিবর্তন এসেছে, সর্বোপরি বয়স। এক নজরে চেনার কথাও নয়। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর মনে পড়ে যায়। কিন্তু আমজাদ কি নন্দকে চিনেছে? একান্তরের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর সেই আমজাদ উধাও হয়ে যায়। শোনা গিয়েছিল, দুবাই চলে গেছে। কবে ফিরেছে কে জানে? স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পর এই প্রথম আমজাদকে দেখলো নন্দ। চেনার পর গায়ের রক্ত শিরশির করে ওঠে। এই কয়েকদিনে তিন-চারবার দোকানে এসেছে আরও কয়েকজনকে নিয়ে।

এরই মধ্যে বেশ সাগরেদ জুটে গেছে। কিন্তু গতকালই শোনা গেল, আমজাদ নাকি সরকারি দলে যোগ দিয়েছে। দুবাই থেকে বেশ পয়সাকড়ি নিয়ে ফিরেছে মনে হচ্ছে। পোশাকআশাক, কথাবার্তায় একটা আলাদা ভাব। খাওয়ার সব বিল দিচ্ছে আমজাদই। সরকারি দলের লোকজন সবাইকে চেনে নন্দ। তবে ভাবেসাবে বোঝা যাচ্ছে না, আমজাদ নন্দকে চিনেছে কিনা। না চিনলেই মঙ্গল। প্রথম দিন চা খেয়ে বেশ তারিফ করেছিল আমজাদ, দ্বিতীয় কাপের ফরমায়েশ করেছিল। দ্বিতীয় চাটা পাঠায় নাসিরকে দিয়ে। এভাবে নিয়মিত হোটেলের আসা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে নন্দকে।

সেই দিনগুলোর কথা ভুলতে পারে না নন্দ। তখন নন্দের কতই-বা বয়স, বারো কী তেরো। স্কুলে পড়তো। বাবা স্কুলে হিসাব সহকারীর কাজ করতেন। মা সেলাইয়ের কাজ করতেন। দুজনের রোজগারে কোনোরকমে চলে যেত সংসার। সেই একান্তর। ডিসেম্বরের সেই নির্বাচনের পর থেকে টের পাওয়া যাচ্ছিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বাবা প্রতিদিন মাকে সব বলতেন। নন্দ সব শুনতো, ভালো করে বুঝতে পারতো না। বাবা নির্বাচনের সময় বেশ খেটেছিলেন বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লিগের পক্ষে। মিছিল করতেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ‘নির্বাচনের কাগজ’ বিলি করতেন। ফিরতে বেশ রাত হয়ে যেত। মা কিন্তু কিছু মনে করতেন না। মাঝে মাঝে শুধু জিজ্ঞেস করতেন, বঙ্গবন্ধু জিতবেন তো? এলাকা থেকে কে দাঁড়িয়েছেন, নির্বাচন করছেন, তার কথা ভালোভাবে জানতেন না। শুধু জানতেন বঙ্গবন্ধুকে জেতাতে হবে। এলাকার প্রার্থী ‘বঙ্গবন্ধু’। গোটা বাংলাদেশে একজনই প্রার্থী ‘বঙ্গবন্ধু’। বঙ্গবন্ধু জিতলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে। ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না।

এরই মধ্যে নন্দ একদিন স্কুলে গিয়ে শুনলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঁপিয়ে পড়েছে বাঙ্গালিদের ওপর। স্কুলের মাস্টাররা বলেন, ঢাকায় যেখানে সেখানে খান সেনারা গুলি চালাচ্ছে, এরপর পাকিস্তানি সেনারা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। এই গ্রামেও আসতে পারে। স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। একের পর এক খবর আসতে লাগলো হামলা, হত্যা, লুটপাট ও ধর্ষণের। কয়েকদিনের মধ্যে দেখা গেল এই হিন্দুপাড়ার অনেকে রাতের আঁধারে চলে গেছে ভারতে। কেউ কেউ থেকে গেল অবস্থা কোনদিকে গড়ায় দেখার জন্য। নন্দের বাবা-মা চিন্তায় পড়ে গেলেন। চেনা লোকজন অচেনা হয়ে গেল রাতারাতি। তারা রাতে ঘুমোতে পারতেন না। যেদিন যোগেন্দ্র কাকা পরিবারের সবাইকে নিয়ে বর্ডারের দিকে চলে গেলেন সেদিন রাতে মা-ই বাবার কাছে কথাটা তুললেন। কিন্তু বাবার এক কথা—না, না আমরা যাবো না। বাবার তখনো অটুট

বিশ্বাস, আমাদের কিছু হবে না নন্দর মা। দেখো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। নন্দর মনে পড়ে, মা এর পরও বাবাকে তাগাদা দিয়েছেন কয়েকবার, চল ভারতে চলে যাই। অনেকে তো চলে যাচ্ছেন। আমাদের এখানে থাকা হবে না। কিন্তু নন্দর বাবা কান দেননি, না না, কিছু হবে না। বাড়িভিটা ফেলে যাবো কোথায়?

বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি বাহিনী বন্দি করে পাকিস্তানে নিয়ে গেছে, এ খবর তখনো গ্রামে এসে পৌঁছায়নি। বাবা আওয়ামি লিগ অফিস থেকে খবর নিয়ে এসেছেন, বঙ্গবন্ধু জাতীয় নেতাদের নিয়ে আত্মগোপন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছেন।

এর মধ্যে গ্রামে তৈরি হলো রাজাকার বাহিনী। আমজাদ তাদের একজন। তারা রাইফেল নিয়ে গ্রামে টহল দিতে লাগলো। হিন্দুদের মধ্যে যারা তখনো গ্রামে থেকে গিয়েছিল, তাদের বাড়িতে বাড়িতে এসে রাজাকাররা হুমকি দিত, টাকাপয়সা, সোনাদানা যা আছে দিয়ে দাও নইলে তোমাদের রক্ষা করতে পারবো না।

এই আতঙ্কের মধ্যে একদিন পাকিস্তানি সেনারা গ্রামে এল মুক্তিবাহিনীর খোঁজে। রাজাকাররা তাদের সঙ্গে। রাইফেল কাঁধে আমজাদ সবার আগে। হিন্দুপাড়ায় ঢুকেই বাড়ি বাড়ি তল্লাশির নামে পুরুষদের ধরে নিয়ে পুকুরপাড়ে একটি লাইনে দাঁড় করালো। মেশিনগান নিয়ে সামনে দাঁড়ায় পাকিস্তানি সেনারা। ক'জনই-বা তখন গ্রামে ছিল। যুবক কিংবা মাঝারি বয়সের সবাই পালিয়ে গিয়েছিল আগেই। গোটা পাড়ায় কান্নাকাটি, চিৎকার-আতঙ্ক। মহিলারা পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের পা ধরে কান্নাকাটি করতে লাগলো।

নন্দর মনে আছে, তার বাবা-সহ জনা পনেরো পুরুষকে পুকুরপাড়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। আর লুটপাট চলে গোটা পাড়ায়। সোনাদানার খোঁজে রাজাকাররা ঘরে ঘরে ঢুকে সবকিছু তছনছ করতে লাগলো। শিশুরা আতঙ্কে চিৎকার করছে। নন্দ বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। সে একবার বাবার কাছে ছুটে যায়, আর একবার পাক সেনা ও রাজাকারদের কাছে, আমার বাবাকে ছেড়ে দাও। মা বাড়ির বারান্দায় বসে কাঁদছেন, আমাদের যা কিছু আছে সব নিয়ে যাও, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। সবারই একই আর্তি। এর মধ্যে আমজাদের কথাই বেশি মনে আছে। সে একবার পুকুরপাড়ে ছুটে যায়, আবার এখানে দৌড়ে আসে। যেন এক মহোৎসব। পাক সেনাদের কাছে গিয়ে বলে, সব ইন্ডিয়া হায় হার। মুক্তি হায়।

নন্দ আর কিছু ভাবতে পারছে না। সেদিনের কথা ভাবলে প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে মনে পড়ে। এর পর থেকে অনেক ঝড় গেছে। আমজাদকে দেখার পর আবার নতুন করে সামনে চলে এসেছে সেই দুঃসহ স্মৃতি। হঠাৎ পুকুরের দিক থেকে শোনা গেল কয়েকদফা গুলির আওয়াজ। আর

অনেক আতঁচিকার। তখনও ভাবতে পারেনি, বাবা নেই। সবাই ছুটে গেল পুকুরপাড়ে। লাইন করে যাদের দাঁড় করানো হয়েছিল, তাদের গুলি করা হয়েছে। সবার মৃত্যু হয়নি তখনো। জল জল বলে চিৎকার করছেন, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। নন্দ গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবার ওপর, তুমি যেও না বাবা। তুমি যেও না। মৃতদেহগুলোর ওপর নারী শিশুরা গড়াগড়ি খাচ্ছে। কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে পুকুরপাড়। এর মধ্যে সেই আমজাদ আর কয়েকজন রাজাকার রাইফেলের বেয়নেট দিয়ে খোঁচাতে লাগলো দেহগুলোকে। যারা বেশি কান্নাকাটি করছে তাদের মাথায় আঘাত করে নির্মমভাবে। যেসব শিশু কান্নাকাটি করছিল তারাও রেহাই পায়নি অত্যাচার থেকে। সেই নারকীয় দৃশ্য স্মরণ করতেও ভয় করে নন্দর। সেই রক্ত, কাতর আর্তনাত, সারি সারি মৃতদেহ। আর রাজাকার, পাকিস্তানি সেনাদের নারকীয় উল্লাস।

মনে আছে, এই কান্নাকাটির মধ্যেই হঠাৎ পাকিস্তানি সেনারা নির্দেশ দিলো গর্ত খুঁড়ে মৃতদেহগুলোকে মাটি চাপা দিতে।

সবাইকে গুলির ভয় দেখিয়ে হটিয়ে দিল। কেউ আর বেঁচে নেই। দূরে দাঁড়িয়ে অন্যদের সঙ্গে নন্দও দেখলো। আমজাদদের উল্লাস এখনো মনে আছে, যেন বড়ো এক কাজ সমাধা করেছে তারা। পাকিস্তানি সেনারা রাজাকারদের দিয়েই গর্ত খোঁড়ালো। তারপর মৃতদেহগুলো সেই গর্তে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। নন্দরা কাঁদছিল, তাদের চিৎকার আর কান্না থামাতে কয়েকবার ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে সেনারা। এক সময় মাটি চাপা দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা চলে যায়। চলে যায় রাজাকাররাও। এর পর সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মাটির ওপর।

মনে আছে নন্দর, গোটা পাড়ার নারী ও শিশুদের রাত কাটে সেই পুকুরপাড়ে। মানুষগুলো কী অন্যায্য করেছে যে, তাদের এমনভাবে তাদের হত্যা করা হবে। দেশ ত্যাগ না করে যারা মাটি কামড়ে পড়েছিলেন তাদের সবাইকে চরম মূল্য দিতে হলো।

তবে আরও সর্বনাশের বাকি ছিল। এই অত্যাচার ও হত্যা করার পর হিন্দুপাড়ায় কারও বাড়িতে উনুন জ্বলেনি। কান্নার রেশ মিলাতে না মিলাতেই তৃতীয় রাতে আমজাদ আরও কয়েকজনকে নিয়ে হামলে পড়ে হিন্দুপাড়ার ওপর। এবার সোনাদানা আর টাকাপয়সা নয়। রাত নটা-দশটা হবে। নিস্তব্ধ চারদিক, শুধু জোনাকিরা আলো জ্বালিয়ে ছোটোছুটি করছে। অন্ধকারে লোকজন ও টর্চের আলোয় গোটা হিন্দুপাড়া আতঙ্কে জেগে ওঠে। প্রায় সব বাড়িতেই ওরা ঢুকে পড়ে দরজা ভেঙে। কেউ যেন পালাতে না পারে তা নিশ্চিত করতে কয়েকজন রাইফেল নিয়ে পাহারা দেয়। সেই বীভৎস রাতের কথা কেউ ভুলতে পারেনি। এই আমজাদের হাতে ধর্ষিত হয়েছে মা, মায়ের পর নন্দ। মায়ের সামনেই। মায়ের আকুতি-মিনতি,



পায়ে ধরা কোনো কিছুতেই টলানো যায়নি আমজাদদের। নন্দর আর্তচিৎকারেও রেহাই মেলেনি। গোটা পাড়ার কেউ রেহাই পায়নি। নন্দর কতই-বা বয়স, এগারো, বারো। শুধু আমজাদ নয়, আমজাদের পর অনেক পশু। জ্ঞান হারিয়েছিল নন্দ। জ্ঞান ফেরে পরের দিন। পাড়ায় কোনো ডাক্তার ছিল না। যন্ত্রণায় কাতরে ছিল বেশ কয়েকদিন। ক্ষত শুকাতে অনেকদিন লেগেছিল।

পরে নন্দ শুনেছে, পাড়ার কয়েকটি মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়েছে আমজাদ ও তাদের সঙ্গীরা, যাদের বয়স আঠারো থেকে পঁচিশ। ওদের নাকি পাকিস্তানি সেনা শিবিরে পাঠানো হয়েছিল। তাদের আর হদিস মেলেনি।

গোটা পাড়া নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যাদের হত্যা করেছে পাক সেনারা, তাদের পারলৌকিক কোনো ত্রিয়াকর্ম করা

যায়নি। বাবার ছবির সামনে বসে কেঁদেছিল নন্দ ও তার মা। আর কীই-বা করার ছিল। অনাহারে কেটেছে অনেক দিন। স্কুল বন্ধ, হিন্দু মুসলমান কয়েকজন শিক্ষককেও হত্যার করেছিল নরপশুরা। স্কুল থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায়নি। সেই দিনগুলো মনে করতে চায় না নন্দ।

শুধু মনে পড়ে, কী যুদ্ধই না করতে হয়েছিল বেঁচে থাকতে। দেশ স্বাধীন হলো, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়লো। গ্রামে খবর পৌঁছালো, বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সেনারা অত্সমর্পণ করেছে। গ্রামের মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়লো। রাস্তায় স্বাধীন দেশের পতাকা নিয়ে মিছিল বেরোলো। মা যেতে চায়নি ঘর ছেড়ে, কিন্তু নন্দ টেনে নিয়ে গেল রাস্তায়। অস্ত্র হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কয়েকটি গাড়ি দেখলো। গাড়িতে স্বাধীন দেশের পতাকা। সবাই ‘জয় বাংলা’

বলে ধ্বনি দিচ্ছে। এর মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের বহরও দেখা গেল। মাকে নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল নন্দ। পাড়ার কেউ কেউ ছিলেন। এর মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল তাদের কেউ কেউ ফিরে আসতে শুরু করেছে। আগের রাতে ফিরেছে পাশের বাড়ির অশোক, গোপালকাকার ছেলে। বাবার সঙ্গে গোপাল কাকাকেও হত্যা করা হয়েছিল। অশোক রাতেই দেখা করতে এসেছিল নন্দদের বাড়িতে। কিন্তু কোনো কথা হয়নি। কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থেকে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় কান্না চেপে বলছিল, ভাবিস না নন্দ, আমরা কাউকে ছাড়বো না।

অশোক কলেজে পড়ে। বি এ পরীক্ষা দেয়ার কথা। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার খবর পাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই অশোক চলে যায়। সঙ্গে আরও কয়েকজন। গোপালকাকা ছেলের চলে যাওয়া কাউকে বলতে নিষেধ করেন। শেষ খবরে জানা গিয়েছিল, অশোক আগরতলায় আছে। প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এপাড়া থেকে যারা চলে গিয়েছিল, সবাই আগরতলায় প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে যায় বলে জানতে পেরেছিল।

রাস্তায় লোকজনের আনন্দ উল্লাস সত্ত্বেও মা দাঁড়াতে চাইছিলেন না। নন্দ জোর করে হাত ধরে রাখে। মা কাঁদছিলেন, কাপড়ের আঁচল দু'হাত দিয়ে চোখে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। কান্না আসছিল নন্দরও। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সৈন্যদের চলাচল দেখতে ভালো লাগছিল। সে বয়সেও বাঁচার কথা ভাবছিল নন্দ। আর ভাবছিল কিছু একটা করার কথা।

প্রতিশোধের আগুন জ্বলতো বুকের ভেতর। কিন্তু কাউকে কখনো বুঝতে দেয়নি নন্দ।

॥ চার ॥

রাত কত কে জানে। নন্দ খাট থেকে নেমে চোখে-মুখে জল দেয়। না, আমজাদকে দেখার পর চাপা-পড়া ক্ষত থেকে যেন আরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মেয়েটা বুঝতে পেরেছে কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনা সে জানে না। নন্দর মনে পড়ে, স্বাধীনতার খবর আসতেই রাজাকাররা কোথায় পালালো কেউ বুঝে উঠতে পারেনি।

পরের দিন ঘুম ভাঙতে স্বাভাবিকভাবেই দেরি হলো। শেফালি আগেই উঠে পড়েছে, ঘর ঝাঁট দিয়ে ধূপধুনো জ্বালিয়ে প্রতিদিনের মতোই বারান্দায় বসেছে। এর মধ্যে মনে হয় কুকুরছানা ও বেড়ালের মধ্যে ভাব হয়ে গেছে। ওরা বুঝতে পেরেছে, এক সঙ্গেই থাকতে হবে। বাগড়া-বিবাদ করে লাভ কী। শেফালি আজও স্থির করেছে, মাসিকে ডাকবে না, আরও

একটু ঘুমোক। অনেক রাত অবধি জেগেছিল, শেফালি জানে।

বারান্দায় হেলান দিয়ে বসে কুকুর বেড়ালের ভাব দেখছে শেফালি। নতুন বন্ধুত্বের পর ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে। সূর্য উঠেছে কিছুক্ষণ আগে, উঠোনে এখনো রোদ পড়েনি। গাছপালা ডিঙিয়ে এ বাড়িতে রোদ উঁকি দিতে আরও কিছুক্ষণ লাগবে। শেফালি এক ফাঁকে ঘরে ঢুকে দেখে, মাসি ঘুমোচ্ছে। ইংরেজি বইটা নিয়ে শেফালি বাইরে বেরিয়ে আসে। মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করে। শেফালি জানে, পড়ালেখায় খারাপ করলে মাসি ক্ষমা করবে না।

ঘুম ভাঙতেই বারান্দার জানালা দিয়ে চোখে রোদ পড়তে হুড়মুড় করে উঠে বসে নন্দ। আজও বেলা হয়ে গেছে। দরজা খুলেই শেফালির ওপরই রাগটা পড়ে, আজও তুই আমায় ডাকিসনি। শেফালি হাসে, তুমি গত রাতেও অনেক দেরিতে ঘুমিয়েছ মাসি। পুরো ঘুম না হলে শরীর খারাপ হবে। তাই ডাকিনি। সমস্যা কী। এর উত্তর নেই, তবু নন্দ বলে, অত পাকামো করবি না।

মাসি তুমি চিন্তা করো না। আমি সব কাজ শেষ করে ফেলেছি। এখন তুমি চানটান করে পূজা সেরে তৈরি হয়ে নাও। রোদ উঠলেও এখনো সাতটা বাজে। নন্দ শেফালিকে নিয়ে পৌনে আটটার দিকে বেরোয়। ওদিকে দোকানেও কাজ এগিয়ে থাকবে, জানে নন্দ। তাই তেমন চিন্তাও নেই।

নন্দ শেফালিকে বলে, ‘আমি চান করে পূজা দিয়ে আজ একটু মন্দিরে যাবো। তুই দোকানে চলে যাস, আমি দেরি করবো না।’

* * * *

এখন কমলাকান্ত দাদুর বয়স হয়ে গেছে। তাঁর ছেলে অভিজিৎই এখন পূজা সামলায়। নন্দ তাকে কাকা ডাকে। নন্দ যখন মন্দিরে পৌঁছায় অভিজিৎকাকাই পূজোর কাজে ব্যস্ত। ঠাকুরদা কমলাকান্তকে প্রণাম করতেই ধমক শোনে নন্দ, ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুর ছাড়া কাউকে প্রণাম করতে নেই জানিস না? নন্দ বলে, ঠাকুর তো আছেনই, তুমিও আমার ঠাকুর।

তা হঠাৎ ছুটে এলি যে, কোনো কথা আছে বুঝি?

একটু আছে। কিন্তু নিরিবিলিতে বলতে হবে।

তাহলে আমার ঘরে চল।

ঘরটা মন্দিরের পেছনে। পাশের ঘরে ভোগ রান্না হয়। দিনের বেলা ঠাকুরদা এ ঘরে কাটান। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে যান। নন্দ আস্তে আস্তে অনেক কথা বলে। এক সময় আঁতকে ওঠেন কমলাকান্ত, এ তুই কী করছিস? আরও পরে চিন্তাভাবনা করা যাবে। এত তাড়া কী সের? এসব মাথা থেকে ছাড়।

নন্দ নাছোড়বান্দা, তুমি কাউকে বলো না কিন্তু। আমার

শরীর ভালো যাচ্ছে না। আমি বুঝি, তুমি বাধা দিও না ঠাকুরদা। আমি যা স্থির করেছি তুমি আমাকে করতে দাও। বলেই নন্দ দ্রুত পা বাড়ায়, আরেকবার মন্দিরে ঢুকে প্রণাম করে—মা আমায় শক্তি দাও। আমি যে একান্তরকে ভুলতে পারি না মা। তুমি আমার পাশে থেকো মা।

কমলাকান্ত নন্দর পেছন পেছন বেরিয়ে এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়ান। মেয়েটা কী করতে চায় কে জানে। কালীবাড়ির উঠোনটা পার হয়ে একটু দাঁড়ায়, ঠাকুরদা আমি দু-একদিনের মধ্যে আবার আসছি কিন্তু। কমলাকান্ত কোনো জবাব দেন না। দাঁড়িয়ে নন্দর চলে যাওয়া দেখেন। মেয়েটার মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে। পাকিস্তানি সেনাদের হাতে বাবাকে হারায়, নির্যাতিতা হয় মা ও মেয়ে, কতই-বা বয়স তখন নন্দর। স্বাধীনতার পর মাকে কখনো হাসতে দেখেনি, কেমন যেন বোবা পাথর হয়ে গিয়েছিল। ওই বয়সে নন্দই সবকিছু সামলায়। কয়েক বছর পর মাও ছেড়ে চলে যায়। এতসব ঝড় ঝাপটার পর কী করে এতদূর এগিয়ে আসতে পারে, বিস্ময়ে মাঝে মাঝে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন কমলাকান্ত।

মন্দির থেকে দ্রুত পা চালিয়ে নন্দ যখন দোকানে এসে পৌঁছায় তখন মাত্র একজন খদ্দের। সবজি রান্না সেরেছে নাসির। শেফালি বলে ওঠে, চা চাপাচ্ছি মাসি। নন্দ জানে তার অপেক্ষায় কেউ খায়নি। নন্দ নিজেই উনুনের কাছে যায়। একজনের পরোটা সবজির ফরমায়েশ পূরণ হতে না হতেই আরও কয়েকজন ঢোকে। শুরু হয়ে যায় দিনের ব্যস্ততা। এখন এক মুহূর্ত সময় নেই। আজ একটু বসে থাকতে ইচ্ছে করছে নন্দর। সেই অতীত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাকে। একটুও যেন স্বস্তি দিচ্ছে না।

সেই ন’ মাসের নরক পার হয়ে স্বাধীনতা এল। মা ছিল, যদিও কথা বলতেন একেবারে কম। তবুও কোনো চিন্তা ছিল না। দুমুঠো খুদ-কুঁড়ো জুটে যেত। কয়েকজন বলেছিল, তোমরা তো বীরঙ্গনা, সরকারের খাতায় নাম তুলতে হবে। মা-মেয়ের নাম একসঙ্গে, হিন্দুপাড়ার অনেকেই এই তালিকায় থাকতে পারে। কিন্তু কেউ রাজি হয়নি। মা অন্তত এইটুকু বুঝতেন, এই লজ্জা বয়ে বেড়ানোর মতো শক্তি তাদের নেই। নন্দকে বলতেন, আমি আর ক’দিন। তোর জন্যই চিন্তা হয় রে। কী করি বলতো। স্বাধীনতার পর এতো করে বললাম, স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিস না। তুই গেলি না।

মা জানে কেন নন্দ যায়নি। সবাই আঙুল তুলবে নন্দর দিকে। ওই বয়সে এতটুকু বুঝে গেছে মেয়েটা। নন্দ শুধু বলতো, তুমি এসব নিয়ে ভেবো না তো মা।

সেই কবেকার কথা। মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, গ্রামে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল নন্দ। ডাক্তার মাকে ঢাকায় নিয়ে যেতে বললো। কিন্তু সেটা নন্দর পক্ষে সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন

ভুগে ভুগে মা চলে গেলেন। নন্দর কোলেই মা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। পাড়ার সবাই সহযোগিতা ছিল, শেষ কাজ করতে সমস্যা হয়নি। তাও আজ পঁচিশ-ত্রিশ বছর হয়ে গেল। মায়ের মৃত্যুর পর নন্দ বাঁচার জন্যই যুদ্ধ করতে করতে এই অবস্থায় এসেছে। আজ কি অন্য ভাবনা নন্দকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে?

শেফালি স্কুলে চলে গেছে। এখন ভিড়ও কম। যেখানে টাকা পয়সা নেয়া হয়, ব্যবসার ভাষায় গদি বলে, তার পাশে একটু আড়ালে একটা চৌকি পাতা আছে। নন্দ দুলালকে ডাকে, শোন এখন ভাত শুরু হতে ঘণ্টাখানেক বাকি। নাসির আর তুই দেখ, সামলা। আমি একটু শুয়ে থাকি।

—তোমার কি শরীর খারাপ মাসি?

—আরে না না এমনি। তোরা যা।

আমজাদকে দেখার পর থেকে নন্দ স্বাভাবিক হতে পারছে না। সেই দিনের স্মৃতি যে ভেতর থেকে হারিয়ে যায়নি তা বুঝতে পারছে। মনে পড়ছে বাবার রক্তমাখা মুখ, মায়ের আঁর্ত আর জানোয়ারগুলোর উল্লাস। বাবার শেষ কথা ছিল, আমি যাচ্ছি রে মা। মা বারবার পা জড়িয়ে ধরেছিল আমজাদের, নন্দও পা জড়িয়ে ধরেছিল বারবার। বলেছিল, আঙ্কেল আমাদের ছেড়ে দেন। আমাদের বাঁচান। কিন্তু জানোয়ারকে নিবৃত্ত করা যায়নি। নন্দকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল আমজাদ। ধাক্কা খেয়ে দেয়ালে গিয়ে পড়ে নন্দ। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছিল। তারপর নন্দকেও রেহাই দেয়নি পশুরা।

হঠাৎ করে এক প্রচণ্ড প্রতিশোধের স্পৃহা যেন মাথা চেপে ধরেছে। সেই একান্তর বারবার মাথায় ভিড় করছে। বাবাকে হত্যা, মা ও নিজের ওপর অত্যাচার একসময় নন্দকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে জেদ এনে দিয়েছিল। কিন্তু বয়স বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মেয়ের ভেতরে তৈরি হওয়া ঘৃণা ও আঙুন টের পাচ্ছিলেন করুণাময়ী, কিন্তু বলেন, এসব মনে আনবে না মা। সময়ই তোকে বলে দেবে কী করতে হবে।

হ্যাঁ, সেই সময়টাই যেন বলে দিচ্ছে, ‘হাঁরে নন্দ একান্তর হাজির। একান্তর আবার এসে গেছে। কী করতে হবে চিন্তা করে নাও।’ ভাবতে ভাবতে এপাশ-ওপাশ করে নন্দ। এক অস্বস্তি শুয়ে থাকতে দিচ্ছে না নন্দকে। নাসির ও দুলাল টের পায়, মাসির শরীর ভালো নেই। এর মধ্যে ভাতের খদ্দেররা এসে গেলে ওরাই খাবার পরিবেশন করে। নন্দ শুয়ে শুয়ে দেখছে, এখন উঠে বসেছে। অন্যদিন হলে নিজেই দৌড়ে যায়, বালতি, হাতা তুলে নেয়। আজ নিজেই দূরে সরিয়ে রেখেছে নিজেকে। বসে বসে দেখছে, দুলাল ও নাসির কীভাবে পরিবেশন করে। না, ছেলে দুটো পারে। সকালটা যেভাবে সামাল দেয়, অন্তর থেকে তাগিদ না থাকলে এটা হয় না। তাদের আন্তরিকতায় গর্ব অনুভব করে নন্দ। পাড়ায় সবাই ঠাট্টা করে, নন্দর দুই ছেলে

এক মেয়ে। নন্দ জবাব দেয়, আমি পেটে ধরিনি গো দিদিরা, কিন্তু ওরা সত্যিই আমারই ছেলে-মেয়ে। ভগবান আমাকে দিয়েছেন। জান তো, সব হারিয়ে ওদের পেয়েছি।

মা করুণাময়ী একসময় বিয়ের চেষ্টা করেছিল নন্দর। কিন্তু সবাই শুনেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, একান্তরে অত্যাচারিতা, ধর্ষিতা মেয়েকে কে বিয়ে করবে। শুনে কয়েকদিন কেঁদেছিল নন্দ লুকিয়ে লুকিয়ে। মা যেন টের না পায়। নন্দর কান্না করুণাময়ী জানতে পারলে তিনি আরও কান্নায় ভেঙে পড়বেন। করুণাময়ী নিজেও জানতেন বিয়ে হবে না, তবু চেষ্টা।

আজ বিকেলেও আসে আমজাদ। সঙ্গে সেই দলবল। অনেকক্ষণ হই-হুল্লোড় করে চলে যায়। কথাবার্তায় মনে হয়, সামনে উপজেলা নির্বাচনে সে প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করছে। কথায় কথায় দলের নেত্রীর প্রশংসা। আর এই সরকার ছাড়া বাংলাদেশ এগুতে পারবে না, বড়ো গলায় বলে। নন্দ তাকিয়ে থাকে। মনে হচ্ছে নন্দকে চিনতে পারেনি। ষাট পেরিয়েছে কয়েক বছর আগে, নন্দকে চেনার কথা নয়।

কয়েকদিন ধরে নন্দ দোকানের ভার শেফালি, দুলাল ও নাসিরের ওপরই দিয়ে রেখেছে। সকালে নিয়ম করে আসে, চাপটা শেষ হওয়ার পরই মন্দিরে যায় ঠাকুরদার কাছে। ফিরতে ফিরতে সেই বিকেল। শেফালিরা বুঝতে পারছে না, কী এমন কাজ ঠাকুরদার কাছে। নন্দ বলে, তোরা চিন্তা করিস না। এই সুরের সঙ্গে শেফালিরা পরিচিত নয়। কেমন যেন ভয় করে।

নন্দ একদিন জানায়, সদরে যেতে হবে। বলেছে, শেফালি এ কদিন স্কুলে যাবে না। বুধের মাকে একটু বেশি সময় এই ক'দিন থাকতে বলেছি। পারবি না তোরা? আমার ফিরতে দেরি হতে পারে।

সবাই সমস্বরে জবাব দেয়, আমরা পারবো মাসি। শেফালি বলে, তুমি সাবধানে থেকো, কয়েকদিন ধরে তোমার শরীর খারাপ। শরীর খারাপের কথা দুলাল ও নাসিরকে কেউ বলেনি। তবে ওরা বুঝতে পেরেছে, তাই পারতপক্ষে কাজে হাত লাগাতে দেয়নি মাসিকে। ফিরতে ফিরতে সেই শেষ বিকেল। এসেই বলে, ঠাকুরদা আর আমাকে দুটো ভাত খাওয়াতে পারবি? এমন খুশির খবর এই হোটোলে প্রথম। মাসি নিজেই ভাত খেতে চেয়েছে। সবজি ছিল, ভাত রান্নায় বেশি দেরি হয়নি। দুজনই বেশ ক্ষুধার্ত। খাওয়া দেখে মনে হয়।

নিজে থেকে না বললে, কিছু জানতে চায় না শেফালি। রাতে শুয়ে মাসিকে জড়িয়ে ধরে, মাসি আজ রাত জেগো না। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়। আজ সারাদিন খুব ধকল গেছে তোমার, আমি বুঝতে পেরেছি।

আরে না, তুই এত চিন্তা করিস না তো। দোকানে আজ কোনো সমস্যা হয়নি তো? দেখিস কিন্তু তাদের ওপরই সবকিছু। আমার তো বয়স হয়েছে মা। তাই তাদের নিয়ে চিন্তা

হয়।

শেফালি অন্য রকম সুর পাচ্ছে মাসির গলায়। হলোটা কী মাসির। জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না।

এভাবে কয়েকদিনই সদরে গেল নন্দ ঠাকুরদাকে নিয়ে। সপ্তাহ দুয়েক পর সদর থেকে ফিরে বলে, আর যেতে হবে না রে। একদম নিশ্চিন্তি। বাব্বা যা অবস্থা, সরকারি অফিসের কাজ বলে কথা! সে রাতে নন্দ খিচুড়ির ব্যবস্থা করে। বলে, চল আজ আমরা খিচুড়ি খাই। অনেকদিন খাইনি। তাদের কোনো আপত্তি নেই তো? দুলালই জবাব দেয়, আপত্তি কেন মাসি, সঙ্গে কিন্তু ডিম ভাজা চাই।

সে রাতে বেশ শান্তিতে ঘুমায় নন্দ। শেফালি শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। মাসির এরকম ঘুম দীর্ঘদিন দেখেনি শেফালি। সেও নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

॥ পাঁচ ॥

স্বাভাবিকভাবেই নন্দরানির সংসার চলছে। এ ক'দিন যেন খদ্দেরও বেড়েছে। রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে, সামনে নির্বাচন। নন্দ নতুন খাবারের পদও বাড়িয়েছে। দুপুরের পরিবেশন আবার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে নন্দ। শেফালি, দুলাল ও নাসির লক্ষ্য করছে, মাসির সেই আগের হাসি-খুশি ভাব ফিরে এসেছে। এতে সবাই খুশি। নন্দ নাসিরকে ডেকে বলে, আজ বাজার গেলে পোস্ত আনিস তো, অনেকদিন আলুপোস্ত খাইনি। এরকম প্রায় প্রতিদিন একটা কিছু খাওয়ার কথা বলে। একটা বেশ খুশির হাওয়া বইয়ে দিয়েছে নন্দ।

রাতে শেফালিকে জড়িয়ে ধরে পড়াশোনার উপদেশ দেয় নন্দ। দোকান কী করে চালাতে হবে সে সম্পর্কে দেয় পরামর্শ। অন্ধকারে শেফালির কান্না আসে। সে তার জন্মের ইতিহাস শুনেছে কিছুদিন আগে। কয়েকদিন খুব মন খারাপ ছিল। পরে যখন বুঝতে পারে, নন্দ মাসিই তো মা। মা থাকলে কি এর চাইতে বেশি ভালোবাসা পেত? তখন আর কোনো ক্ষোভ থাকে না। এখন কান্না পাচ্ছে, কারণ নন্দ মাসির গলায় যেন অন্য রকম সুর। কোথাও যেন একটা কিছু হচ্ছে। ভালো-খারাপ বুঝতে পারছে না। ভগবানকে ডাকে শেফালি— হে ঠাকুর, মাসির যেন কিছু না হয়। সারারাত মাসি শেফালিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমায়। তাই সকালে উঠতে গেলেই ঘুম ভেঙে যায় মাসির। এখন সকালবেলা উঠে চানটান সেরে পুজোয় বসে মাসি, অনেক সময় লাগে। গুন গুন করে গান করে, ঠাকুরের গান। শেফালির ভালো লাগে। কোনোদিন নন্দ এত সময় পুজায় দেয়নি। শেফালিও পাশে বসে থাকে পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত। শেফালি প্রার্থনা করে, ঠাকুর, মাসিকে ভালো রেখো। পুজো শেষ হলে দুজনই প্রসাদ পায়। এমন তৃপ্তি শেফালি

আগে পায়নি।

দোকানে গিয়ে কখনো হেঁসেল, কখনো খদ্দেরদের পাশে, কখনো দুলাল নাসিরকে কাছে টেনে কথা বলে, বুঝলি, খদ্দের হলো লক্ষ্মী, কখনো অনাদার করতে নেই। আজ সকালে হঠাৎ স্কুলের প্রধান শিক্ষক রামতনুবাবু আরও কয়েকজন শিক্ষককে নিয়ে দোকানে আসেন। স্কুল বন্ধ। কোথাও গিয়েছিলেন বা যাচ্ছেন হয়তো। এসেই বলেন, আমরা আজ লুচি আর সবজি খাবো। চেয়ার মুখে দিয়ে স্যারদের বসায়। খাওয়া দাওয়া শেষ করে যখন উঠতে যাবেন, নন্দ জিজ্ঞেস করে, আজ তো স্কুল বন্ধ। স্যারেরা কই যান?

রামতনুবাবু বলেন, আমরা একটু সদরে যাবো মা। কাজ আছে আমাদের, স্কুলের কাজ। ফিরবো দুপুরের পরই। নন্দ বলে, তাহলে স্যাররা ফেরার পথে আমার দোকান হয়ে যান। দুপুরের ভাতটা এখানেই রান্না করি। একদিন খেয়েই দেখুন না।

রামতনুবাবু এক কথায় রাজি। নন্দর রান্নার সুখ্যাতি শুনেছি, আজ খেয়ে দেখা যেতে পারে। কী বলেন আপনারা। এখন আসি মা, আশা করছি দুটো আড়াইটার মধ্যে ফিরতে পারবো।

স্যাররা বেরিয়ে যেতেই নাসিরকে বাজারে পাঠায় নন্দ, যা দৌড়ে গিয়ে মুরগি নিয়ে আস। মাছ যা আছে হয়ে যাবে। বাকিটা আমি দেখছি। দুপুরে স্যারেরা এলেন। বলা যায় খেয়েই তৃপ্তিতে টেকুর তুললেন। রামতনুবাবু বললেন, শুনেছিলাম তুমি ভালো রাঁধো, আজ বুঝলাম, সত্যিই ভালো তোমার রান্না। তাইতো বুঝতে পারছি, কেন লোকে তোমার দোকানেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

প্রশংসায় বুক ভরে ওঠে নন্দর। সে বলে, আপনারা আসবেন, যখন যা পারি করবো। আজ কিছুতেই টাকা নিতে রাজি হলো না নন্দ, স্যারদের তো আমিই নিমন্ত্রণ করেছি। সকালে নিজেরা এসেছেন, খাওয়ার পর দাম দিয়েছেন। এবেলা তো আমি নিতে পারি না।

দুপুরের ভাতের চাপ ছিল আজ বেশি। দুপুরের পাট চুকে যাওয়ার পর ঘন্টাখানেকের মতো বিশ্রাম থাকে। আজ সবাইকে কাছে টেনে বলে নন্দ, এবাবেই সবার ভালোবাসা আদায় করবি। ভালোবাসা না পেলে কোনো ব্যবসাই চলে না। আমি লেখাপড়া শিখতে পারিনি। আমার বাবাকে পাকিস্তানি সেনা আর রাজাকাররা হত্যা করেছে। এ পাড়ার অনেককে হত্যা করেছে। আমরা নির্ধাত হয়েছি। সব জানবি পরে। একেবারে পথে বসেছিলাম, ভগবানের দয়ায় আজ এখানে উঠে এসেছি। তোরা সবাই এখন বিশ্রাম কর। নন্দ চোঁকিতেই শুয়ে পড়ে। দুলাল আর নাসির বেঞ্চেই শুয়ে থাকে পাশাপাশি।

যেদিন স্কুল থাকে না শেফালি কখনো দুপুরে শোয় না। সামনে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাস, অটোরিকশা, রিকশা চলাচল দেখে। কখনো চড়েনি এসব যানবাহনে। মাঝে

মাঝে নিজেকে বাস-অটো রিকশার যাত্রী কল্পনা করে অনেক দূরে চলে যায়। সেটা গ্রাম কিংবা শহর। গ্রাম দেখেছে, শহর দেখেনি। শুধু বড়ো বড়ো বাড়ি কল্পনা করে। অনেক গাড়ি-ঘোড়া, অনেক মানুষ। শোরগোল। হয়তো সেটাই শহর। এভাবে ধীরে ধীরে বিকেল নামে। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ে, এসময় পুরো দোকান রোদে ভরে যায়। পর্দা নামিয়ে দিতে হয়। শীতে অবশ্য রোদটা সবাই উপভোগ করে।

দুলাল ও নাসির পাশাপাশি দুই বেঞ্চে শুয়ে ফিসফিস করে, মাসির মুখে এমন কথা তো আগে শুনিনি। কী হয়েছে মাসির।

শেফালি আগে কয়েকবারই বলেছে, মাসি দুপুরে ভাতের পর তুমি বাড়ি গেলেই পারো। আবার বিকেলে চলে আসলে হয়। এই সময় এখানে কাজ থাকে না। আর আমরা তো আছি। নন্দ রাজি হয় না, দূর পাগলি তোদের একা রেখে কোথায় যাবো? তাই তো এখানেই একটু গড়িয়ে নিই। তোদের সঙ্গে থাকতেই তো ভালো লাগে।

বেশ আনন্দের কাটছে সময়। সেই গুমোট ভাবটা যেন কেটে গেছে। মাসি প্রায়ই গল্প করে। কুকুরের বাচ্চা আর বিড়ালকে নিজেই খাওয়ায়, কোলে তুলে নেয়। এ যেন অন্য এক মাসি। শেফালি খুশি, দুলাল-নাসিরও খুশি। এর মধ্যেই মাসি বলে, আমাকে ছুটি দে, আমি বিশ্রাম নিতে চাই। তোদের তো তৈরি করেছি, তোরা পারবি না দোকানটা চালাতে? দুলাল নাসির দুজনেই বলে, আমরা পারবো মাসি। কিন্তু শেফালি জবাব দেয় না। সে মাসির এ কথার মানে খোঁজার চেষ্টা করে। এ আবার কী কথা। মাসি এমন করে কথা বলছে কেন?

কয়েকদিন পর সকাল থেকেই প্রচুর ভিড় নন্দরানির সংসারে। সদর থেকে বহু লোক এসেছে। এখানে কোথায় জানি সভা হবে। সন্ধ্যার আগেই অবশ্য ফাঁকা হয়ে গেল। সদর থেকে কয়েকজন নেতা এসেছিলেন, সভা করে এই কিছুক্ষণ আগে চলে গেলেন। নন্দর দোকানে সবাইকে চা-বিস্কুট খাওয়াল আমজাদ। আমজাদ বেশ হাসি-খুশি। তার উপজেলা চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়া নাকি নিশ্চিত। ওপর থেকে পাকা খবর এসেছে। সন্ধ্যার আগে সাজোপাঙ্গদের নিয়ে শেষ দফা চা টেবিলে। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরের দিকে উঠছে। সিঙ্গারা ভাজছে দুলাল। গরম গরম সিঙ্গারা চায় ওরা। নাসির এক ফাঁকে উনান ঘুরে গেছে। শেফালি চা বানাচ্ছে।

হঠাৎ আর্তচিৎকার সামনে থেকে। লোকজন দৌড়াচ্ছে। দৌড়াল শেফালি, দুলাল, নাসির। নন্দ মাসি ওকি করছে, পাগল হয়ে গেল নাকি! দোকানে তরিতরকারি কাটার বাঁটি মাসির হাতে। রক্তে লাল। আমজাদ রক্তে ভাসছে। মাথা দুফাঁক, গলা কাটা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে টেবিল চেয়ার, মেঝে। মাসি তখনো কোপাচ্ছে পাগলের মতো। নন্দর রণমূর্তি দেখে সবাই ভয়ে দূরে সরে গেছে। শেফালিই প্রথম ছুটে গিয়ে মাসিকে ধরে, ও

কী করছো মাসি লোকটা মরে যাবে যে!

মারতেই তো চাই। আমার বাবাকে মেরেছে, মা আর আমার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। গোটা পাড়ায় হামলা হয়েছে এর নেতৃত্বে। এ পাড়া বিধবা পাড়া হয়েছে ওদের কারণে। পাকিস্তানি সৈন্যদের ওরাই নিয়ে এসেছিল। স্বাধীনতার পর ও পালিয়ে গিয়েছিল। এক সঙ্গে এভাবে কথা বলে হাঁফাচ্ছে নন্দরানি। মুখে, শাড়িতে টকটকে লাল রক্ত। কেউ এগুতে সাহস করেনি। শেফালি মাসিকে ধরে এনে ভেতরে বসায়। মাসির পাশে বসে দুলাল, নাসির। দোকান এর মধ্যে ফাঁকা। সবাই দূরে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি দেখছে। আমজাদ পড়ে আছে মাটিতে। চিৎকার করছে—পানি পানি।

জ্বলে ওঠে নন্দরানি, ‘খবরদার, সেদিন জলের জন্য সবাই কাতরাচ্ছিল, এক ফোঁটা জল দিতে দেয়নি হারামজাদা। এও ওইভাবে মরুক। খবরদার জল দিবি না।’ মাসির এই রূপ কেউ কখনো দেখেনি। সবাই ঘাবড়ে গেছে। অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের মেয়েটি এমন ভয়ংকর হয়ে উঠলো কীকরে। এর মধ্যে কেউ কেউ এগিয়ে এল, আমজাদকে সদরে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করার তোড়জোড় চলছে। একটা অটো পাওয়া গেল। ধরাধরি করে অটোতে তোলা হলো আমজাদকে। পাড়ার লোকজন ছুটে এসেছে। মন্দিরে খবর পেয়ে ঠাকুরদাও ছুটে এসেছেন। মাসির মাথায় হাত রেখে বলেন, এই ছিল তোর মনে? আমাকে নিয়ে তাই এতো দৌড়ঝাঁপ করলি? এখন আমি কী করি বলতো?

একটা রাজাকার নিকেশ করে দিয়েছি ঠাকুরদা। আমি মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারিনি। আজ আর কোনো দুঃখ নেই। আমি এখন শান্তিতে মরতে পারবো। আর শেফালিদের আমি ব্যবস্থা করেছি, তাদের চিন্তা নেই। ঠাকুরদা যেভাবে বলে সেভাবে তোরা চলবি। ঠাকুরদাই তাদের অভিভাবক। এরই মধ্যে শোনা গেল পুলিশ আসছে। মাসি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে। ভিড় আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন মন্তব্য করে, রাজাকার আমজাদ নেতা হতে চায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ এলো ছইসিল বাজিয়ে। যেখানে আমজাদের ওপর আক্রমণ হয়, সে জায়গাটা ঘিরে ফেলে।

পুলিশ অফিসার বলেন, রক্তের দাগ কেউ পারাইবা না। জিজ্ঞেস করেন, এই মেয়েটি আক্রমণ করেছে? নন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, হ্যাঁ, দারোগা সাহেব। মুক্তিযুদ্ধে আমি যেতে পারিনি, আজ সেই মুক্তিযুদ্ধই করলাম। চলুন কোথায় যেতে হবে।

নন্দরানি পুলিশের গাড়িতে উঠল। তার আগে ঠাকুরদাকে ওদিকে ডেকে নিয়ে কী যেন বলে গেল। দোকানে দুজন পুলিশ বসে থাকে। শেফালি, দুলাল, নাসির কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যায় পুলিশের গাড়ির কাছে। নন্দ হাত বাড়িয়ে বলে, তোরা চিন্তা করিস না। সব আমি ঠিক করে রেখেছি। তোদের কাজ হলো আমার অতিথি, আমার এই সংসার বাঁচিয়ে রাখা। তোদের মধ্যেই আমি বেঁচে থাকবো। সব সময় মনে রাখবি এই আমার সংসার, তোরা আমারই ছেলে-মেয়ে।

পুলিশের গাড়ি চলে গেল। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে শেফালিরা। কোথেকে কী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে গেছে। চারদিক আজ বড্ড বেশি গুণশান। লোকজনের চলাচল কমে গেছে। আশপাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। ঠাকুরদা বসে আছেন দোকানের ভেতরে। তিনজনই ছুটে এল ঠাকুরদার কাছে। ওদের কাছে টেনে নেন ঠাকুরদা।

এই শেফালিকে আমি একদিন নন্দরানির হাতে তুলে দিয়েছিলাম। সে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। তোরা সবাই শোন, নন্দ দোকানটা তোদের তিনজনকে দিয়ে গেছে। তবে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত আমি তোদের সঙ্গে থাকবো। বাড়িভিটা ও সপ্তের ফসলি জমি পাবে শেফালি। শেফালি একা নন্দর বাড়িতে থাকতে পারবে না। তাই আমার বাড়িতে থাকবে। সেখানে থেকেই পড়াশোনা করবে আর দোকান চালাবে। নন্দর দোকানটা তোরাই রক্ষা করবি। দুলাল ও নাসিরের উদ্দেশ্যে বলেন ঠাকুরদা, আজ দুজনেই দোকানে থাকিস। পুলিশ থাকবে তো। আর হ্যাঁ দোকানটা কিন্তু তোদের তিনজনের।

ঠাকুরদা শেফালিকে নিয়ে নন্দরানির সংসার থেকে রাস্তায় পা বাড়াতেই শুনলেন, হাসপাতালে নেয়ার পথেই আমজাদের মৃত্যু হয়েছে।





পরিবর্তন

মৌ চৌধুরী

বাড়িটার সামনে এসে কিছুটা যেন থমকে গেল নদী। কত বছর নাকি
কত যুগ পার করে আজও এই বাড়ির ভেতরে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন অযত্ন
অবহেলায় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে বাড়িটা। এক সময় এই বাড়িতে নিজেও কত

অযত্ন অবহেলা সহ্য করেছে। তারই প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে যেন এই বাড়িটা।

বাড়িটা দেখতে দেখতে মনের মধ্যে কত কথা ভেসে এলো। এক লহমায় নদীর কাছে যেন গুলিয়ে গেল আজ কত তারিখ, কী বার। মনে হলো দূরে কোথায় কোকিল ডাকছে। তবে কি এটা বসন্তকাল? কীসের একটা বেশ মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে। পাকা কাঁঠালের মতো। নদী ভাবল এখন বসন্তকাল হলে পাকা কাঁঠালের সময় তো নয়। তারপরেই মনে হলো আরে এটা তো কাঁঠালিচাঁপা ফুলের গন্ধ। এই গাছটা তো সেই কবে লাগিয়েছিল ও। সেই গাছটা কী আজও আছে, এখন ফুল ফোটে? প্রথমে খেয়াল করেনি, এখন দেখল মাধবীলতা গাছটাও ছেয়ে আছে ঢোকার মুখে গেটের ওপরে। গাছটা যখন লাগিয়েছিল তখন খুব ছোটো ছিল। এখন কত বড়ো হয়ে গিয়েছে। বর্ষায় ফুল ফুটে। নদী ভাবল, কলতলায় পাঁচিলের পাশে দোলনচাঁপা ফুলের গাছগুলোর কথা। বর্ষায় থোকায়-থোকায় সাদা ফুলে-ফুলে ভরে থাকতো। সকাল-সন্ধ্যায় মন মাতাল করা গন্ধ ছড়াতো। আর বারান্দার দুপাশে নাইট কুইন গাছগুলোয় মধ্যরাতে ফুল ফুটতো। শোবার ঘরে জানালা দিয়ে কী অপূর্ব গন্ধ আসতো। চাঁদ-ওঠা রাতে জানলার পাশে বসে মন কেমন করা মায়াবী আলোয় গাছগাছালিরা স্নান করতো। জানালা দিয়েই দেখা যেতো দূরে মানসাই নদীর ধু-ধু চর। যেন অন্য জগৎ। মাঝেমাঝে শেয়াল ডেকে উঠতো। তখন একা ঘরে ওর একটু ভয় ভয় করত। অন্ধকার হলে আকাশে কত তারা দেখত পুর্বের এই জানালাটা দিয়ে। কোনটা কালপুরুষ, কোনটা ধ্রুবতারা, আরও কত তারা ও চেনে।

আজ বাড়িটায় ঢোকার মুখে কেউ বরণডালা নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। প্রায় নিস্তব্ধ জনহীন বাড়িটাতে একাই তো যাওয়ার কথা। নদী ভাবে, এই বাড়িতে বসবাসের দিনগুলোর ভেতর বেশিরভাগই ছিল তিক্ত স্মৃতির। সবটাই বেদনাময়। কেবলমাত্র ওই ফুলের গাছগুলো আর মানসাই নদীটাই মন ভরিয়ে রেখেছিল। বাড়িটা নদীর স্বশুরবাড়ি।

নদীর বিয়ে হওয়ার সময় ওর বয়েস সদ্য একুশ পেরিয়েছে। গ্র্যাজুয়েশনের শেষ সেমিস্টার দিয়েছে, রেজাল্ট তখনও বের হয়নি। সেই সময় একরকম জোর করেই বাবা এই বিয়েটা দিয়ে দেন। নদীর ঘোরতর আপত্তি, বিয়ে করবে না বলে কান্না। মা, আত্মীয়-স্বজনদের অমত উপেক্ষা করে তাকে অনাহুত সন্তান মনে করে বাবা এই বিয়েটা দিয়েছিল। অথচ কত স্বপ্ন ছিল মাস্টার্স করবে। কিন্তু কিছুই হলো না। নদী মনে করত, বাবা কলকাতা থেকে সেই কতদূরে উত্তরবঙ্গের এই ছোটো শহরটায় বিনা অপরাধে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। বাবার এক পরিচিতির মাধ্যমে এই সম্বন্ধটা হয়েছিল। নদীর স্বামী নীহার একটা কলেজে পড়ত। বাবার কাছে এটাই সুপাত্রের একমাত্র মাপকাঠি ছিল। নীহার ছিল নদীর থেকে অনেকটাই বড়ো। তখনই সে ত্রিশ পার করে ফেলেছে। স্বশুরবাড়িতে প্রচুর লোকজন। বিয়ের পরদিন থেকেই সব স্বপ্ন ভেঙ্গে শাশুড়ির নির্দেশে সংসারের সমস্ত কাজে হাত লাগাতে হয়েছিল। শাশুড়ি বলত স্বশুরবাড়িতে খেটে খেতে হয়। কেউ বসে খাওয়াবে না। এত খাটুনি যে অল্পদিনেই হাত-পায়ের নখ খারাপ হয়ে গেল। মাথার চুল উঠে যেতে থাকল। শরীরের কোমলতা, রং

নষ্ট হয়ে গেল। সাজগোজের কথা ভুলেই গিয়েছিল। খুব অভিমান হতো বাবার উপর। স্বামী নীহারের কলেজ ছিল নারায়ণপুরে। অনেকটাই দূরে। নারায়ণপুরে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকত সে। মাঝেমাঝে বাড়িতে আসত। নদীর ধারণা ছিল হয়তো কিছুদিন পর সেখানে নীহার ওকে নিয়ে যাবে। নিজের সংসার গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখত। নীহারের কর্মস্থলে যাওয়ার কথা তুলে তার কাছ থেকে প্রচণ্ড বকা শুনেছি নদী। প্রায় মারতেই গিয়েছিল। নীহার কখনই নদীর অবহেলার দিকগুলি ভাবেইনি, সে এই বিষয়ে নজরও দিত না। নদী ভাবত এই কি বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন! কেবলমাত্র উপেক্ষা। জবাব পায়নি নিজের কাছে।

সদ্য বিবাহিত বলেই কেউ নদীর দিকে আলাদা নজর দিত না। নদী ভাবে এখনকার দিনে এমন শাশুড়ি বা স্বশুরবাড়ি হয় নাকি! শাশুড়ির নদী নামটা পছন্দ নয়। তাই নাম পালটে হলো সানন্দা। এই নামটা আবার একেবারেই পছন্দের নাম নয় নদীর। তবুও নীহারের কথায় এবং অশান্তি এড়াতে মনে নিয়েছিল। গ্র্যাজুয়েশনের রেজাল্ট বের হওয়ার বেশ পরে স্বামীকে বলে কোনো লাভ না হওয়ায় শাশুড়িকে মাস্টার্স করার কথা বলেছিল। তাঁর যা মুখের ভাষা ছিল লজ্জার থেকে ঘেমা পেয়েছিল বেশি। নীহার মনে করত স্ত্রীর একমাত্র কাজ হলো স্বশুর-শাশুড়ির সেবা করা। তাই সে বাবা-মার হেফাজতে বউকে রেখে চলে গিয়েছিল। ওর স্বশুর ভালো ব্যবসায়ী ছিলেন। স্বামীও অনেক টাকা রোজগার করত, কিন্তু এই বাড়িতে খাবার, পোশাক সবই ছিল অতীব নিম্নমানের। গান শোনা, বই পড়া কল্পনার অতীত। ও বুঝতেই পারে



সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

না এভাবে কী করে থাকা যায়। নীহার কখনই একটিও টাকা ওকে দেয়নি। নীহারের দুই বোন অসম্ভব খারাপ ব্যবহার করত ওর সঙ্গে। মূলত তারাই শাশুড়িকে পরিচালনা করেছে। দুই ননদের ওর প্রতি কেন যে এত হিংসা বুঝতেই পারত না নদী। ও জানে একটা পরিবারে সবাই খারাপ হয় না। যেমন ওর স্বশুর, তিনি নদীর বেদনার কথা

বুঝতেন। কিন্তু তাঁর দজ্জাল স্ত্রী আর মা-মুখো ছেলে আর মুখরা মেয়েদের জন্য কিছুই করতে পারেননি। আর ছিল অপূর্ব। অপূর্ব নদীর সম্পর্কের কাকাস্বশুরের ছেলে। নীহারের খুড়তুতো ভাই। সে ছিল প্রায় নদীর বয়েসি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। অনেকটা যেন স্নেহময় দাদা। নদীর প্রতি নীহারের খারাপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করত। কিন্তু

এমন নোংরা অপবাদ জুটে গেল যে নদীর সঙ্গে লজ্জায় কোনো কথাই বলত না।

মনের গভীর সুখহীনতা নিয়ে একটা বছর কোনোমতে পার করেছে নদী। এরই ভেতর কিছুটা জোর করেই সন্তান এনেছিল ও। ওর ধারণা ছিল হয়তো সন্তান এলে নদীর প্রতি মনোযোগী হবে নীহার। এক রকম

জোর করে সন্তান নেওয়াতে কটু কথা শুনিয়েছিল নীহার। নদী ভেবেই পেত না কেন নীহার তার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করে। সন্তানের জন্মের ঠিক আগে যেদিন চরম সত্যিটা জানলো সেদিন আত্মহননের পথটা বেছে নিতে চেয়েছিল নদী। কেবলমাত্র অনাগত সন্তানের কথা ভেবে চরম সিদ্ধান্তটা নিতে পারেনি।

সন্তানসম্ভাবা হওয়ার পরে নীহার আর তার মা একরকম জোর করেই নদীকে কলকাতায় ওর মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দেয়। নদী বেশ বুঝতে পারছিল ওর সেবায়ত্তের পরিশ্রম আর হয়তো খরচ থেকে বাঁচতেই বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় এসে যেন বাঁচল নদী। অনেক দিন কেটে গেলেও নীহার বা শশুরবাড়ির কেউ একটা খোঁজ খবর করেনি। নদীর বাবা-মা নীহার আর তার মা-বাবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে গিয়েছেন। নীহারদের দিক থেকে যোগাযোগের উৎসাহ দেখা যায়নি। তবে নদী অপূর্বর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রেখেছিল।

এই অপূর্বই নদীর বাবাকে আসল সত্যটা জানিয়েছিল। কানাঘুষো ছিলই তবুও সঠিকটা হলো নীহার নারায়ণপুরে একজন মহিলার সঙ্গে অনেকদিন থেকে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করছে। মায়ের কথায় প্রচুর পণ নিয়ে নদীকে বিয়ে করেছিল। এসব কথা অপূর্ব কিছুদিন আগে বিস্তারিত জেনেছে। তবে প্রথম থেকেই নদীর শাশুড়ি সব জানত। ভেবেছিল ছেলের বিয়ে দিলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে।

কথাটা শুনে পাহাড় ভেঙে পড়েছিল নদীর মা-বাবার মাথায়। নিশ্চূপ হয়ে গিয়েছিল নদী। এতবড়ো প্রতারণা হতে পারে ভাবেইনি।

নীহারের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে প্রথম থেকেই বাবার উপর রাগ, অভিমান ছিল। সব শোনার পরে সেই অভিমানটা যেন উবে গেল। বদলে নিজের কপালের কথা ভেবে নিজের প্রতি করুণা হচ্ছিল। ওর সবে বাইশ বছর বয়েস। এরই ভেতর একদম একা এতটা রক্ষা জীবনের মরুভূমি পার করা সত্যিই কঠিন।

* * * * *

অনেক বছর পার করে নদী ভাবে এক বছরের শ্বশুর বাড়ির নরকবাস অনেক শক্ত করে দিয়েছে ওকে। তাই সহসা কাউকে ভরসা করে না, বিশ্বাসও করে না। এক বর্ষার সন্ধ্যায় নদীর কোল ভাসিয়ে সন্তান এলো। মেয়ে হয়েছে দেখে খুব খুশি হয়েছিল ও। সেই দিনই মেয়ের নাম রেখে ছিল বৃষ্টি। বর্ষায় জন্ম বলে নয়, নদীর পরিপূরক হিসাবে বৃষ্টি।

এরপর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই নদীর কাছে। মেয়েকে নিয়ে এই বয়েসেই একা লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

ওর জীবনের কঠিন মরুভূমির প্রান্তে মরুদ্যান হয়ে এসেছিলেন নদীর মায়ের একটু দূর সম্পর্কের এক দাদা। তাকেই নদী নিজের মামা বলেই ছোটবেলা থেকে জেনেছে। তিনি দিল্লিতে থাকেন। নদীর এই মামার একমাত্র সন্তান খুব অল্প বয়েসেই মারা যায়। সেই শোকে মামিও বেশিদিন বাঁচেননি। শেকড় হিসাবে এই মামাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইল নদী। ওর মামা নদীর দিল্লি যাওয়া নিয়ে খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন এমনটা নয়। আসলে একার সংসারে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তবে পরিস্থিতি, নদীর

ঘুরে দাঁড়ানোর জেদ, জোরাজুরি ওর মনের অবস্থা সব দেখে তিনি রাজী হলেন। নদীর মামা কিন্তু ওকে অবহেলা করেননি। দিল্লি নিয়ে গিয়ে নিজের মেয়ের মতোই আগলে রেখেছেন। নাতনির জন্য আয়া রেখে দেওয়া, সঠিক চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় খাবার থেকে বড়ো হয়ে শিক্ষা সব দিক সামলেছেন। সবথেকে জরুরি কাজটা করেছিলেন নদীকে জোর করে মাস্টার্সে ভর্তি করে দেওয়া। শুরুতে ফের লেখাপড়া করতে মন চাইছিল না নদীর, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে সায় দিল। আবারও ক্লাসে গিয়ে নতুন সহপাঠী পেয়ে অনেকটাই শক্ত হয়ে উঠল ও। এদিকে অপূর্বর সঙ্গে যোগাযোগটা ছিলই। তার কাছে নদীর শর্ত ছিল নীহারের কথা, শ্বশুরবাড়ির কারও বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। অপূর্ব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু কথা তো আসবেই।

সময় কখনোই থেমে থাকে না। নদী শুনেছে ওর শ্বশুর বার কয়েক নদীর বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে নদীকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু সেখানে যাওয়ার কথা নদী আর ভাবে না। অপূর্বর কাছ থেকে ও শুনেছে নারায়ণপুরের অনেকেই নীহারের অবৈধ সম্পর্কের কথা, বিয়ের কথা জানতে পেরেছে। অপমান সয়ে চাকরিটা করছে কিন্তু অধ্যাপক হিসেবে প্রাপ্ত সম্মান আর এখন নেই। নদীর অনেক বিয়ের প্রস্তাব এলেও রাজী হয়নি ও। বাবা-মা-মামা পরে আর জোর করেননি।

নদীর বৃষ্টিকে ঘিরেই জীবন। সবাই জানে ও সিঙ্গল মাদার। মায়ের পরিচয়ে বড়ো হয়েছে ও। মামার জন্য আর্থিক দৈন্য হয়তো খুব একটা নেই নদীর কিন্তু মেয়ে আর মামার জন্য অক্লান্ত



সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

পরিশ্রমটা আছে। মেয়েকে বড়ো করার লড়াইটা চলছেই। তবে এই পরিশ্রমে কোনো কষ্ট নেই, অপমান নেই। খুব ছোটো থেকেই মেয়েকে নিজের কষ্টটা বুঝিয়েছে ও। খুব মেধাবী আর সহিষ্ণু মেয়ে বৃষ্টি। প্রথম থেকেই নদী চেয়েছিল মেয়ে বড়ো হয়ে অন্য কোথাও সেটল করুক। সেভাবেই তৈরি

হয়েছে বৃষ্টি। এর পেছনে মামার অবদান সবথেকে বেশি। মামার যোগাযোগের চেষ্টায় বৃষ্টি সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেয়েছিল আমেরিকার একটি কলেজে। এই দিনটির জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল নদী। মেয়ে অনেক দূরে চলে যাবে ভেবে মনটা খারাপ হলেও স্বপ্ন পূরণের

হাতছানি ছিল। নদী মেয়ের কাছে ওর জীবনের কথা, নীহারের কথা বলেছিল। মেয়ের কাছে কিছুই গোপন করেনি। নদী দেখেছে বাবা শব্দটার প্রতি বৃষ্টির কোনো টান নেই।

অপূর্বর কাছ থেকে নদী জানতে পেরেছে তার শ্বশুর মৃত্যুর আগে যাবতীয় সম্পত্তি বৃষ্টির নামে লিখে

দিয়ে গিয়েছে। শুনে ঘৃণা হচ্ছিল নদীর।
বৃষ্টি ওর একার মেয়ে। শ্বশুরের আর
শ্বশুরবাড়ির সকলের নাকি বৃষ্টিকে
দেখার খুব আগ্রহ। ওদের একমাত্র
বংশধর বৃষ্টি। গোটা পরিবারের প্রায়
সবাই একজন অল্প বয়েসি মেয়ের সঙ্গে
এমন প্রতারণা করেছে, এত কষ্ট
দিয়েছে মনে হলেই নদীর স্বপ্ন দেখার
বয়সের স্মৃতিগুলো জীবনের অভিশাপ
বলে মনে হয়। পুরনো দিনের কথা,
নিজের অপমানের কথা মনে হলেই
নদীর মন অস্থির হয়ে উঠত। তখন সেই
ছেলেবেলা থেকে বৃষ্টি মায়ের মুখ
নিজের বুকে নিয়ে আগলে রাখত।
বারবার বলত, মা আমি তোমার মতো
হব। আমার মা-বাবা তুমিই। যে
লোকটা আমাকে জন্ম দিয়েছে যদি
কোনো দিন দেখা হয় বাবা বলে ডাকব
না, বাবা বলে মানব না। দেখো আমি
মুখ ফিরিয়ে রাখব।

অপূর্বর কাছ থেকে নদী জানতে
পেরেছে বৃষ্টি আমেরিকা চলে যাওয়ার
পরের বছর নীহারের মা মারা যায়।
নীহারকে তার মায়ের শেষ কাজ করতে
দেওয়া হয়নি। অপূর্ব বলেছিল,
নীহারকে কেউ ক্ষমা করেনি। শ্বশুরের
ব্যবসা এখন অন্য কেউ সামলায়। অপূর্ব
বলত, নদী তুমি একটুও দুঃখ করো না।
নীহার যে কাজ করেছে তার চরম শাস্তি
পাচ্ছে। কতটা অন্যায্য করেছে তোমার
সঙ্গে এখন বুঝতে পারছে। নদী বারবার
করে নিষেধ করে এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে
আলোচনা করতে। নদী জানে ওর
শ্বশুরবাড়ির যাবতীয় সম্পত্তির
মালিকানা এখন বৃষ্টির। এসব ভাবলেই
শরীর কেমন গুলিয়ে ওঠে নদীর।

প্রায় দু'বছর পর বৃষ্টি দেশে

ফিরছে। এবারে একটা খুব কঠিন
সিদ্ধান্ত নিতে হবে নদীকে। অপূর্ব
জানিয়েছে, নীহার মৃত্যুশয্যায়। সকলের
কাছ থেকে একরকম দয়াভিক্ষা করে
বাড়িতে এক কোনায় পড়ে আছে।
প্রাণটাই কেবল যায়নি। সব হারিয়েছে
নীহার। এমনকী তার রিটার্মেন্টের
পর যাবতীয় টাকা সেই মহিলাকে দিতে
হয়েছে। এখন সে বারবার করে নদীকে
আসতে বলছে। নদীর কাছে ক্ষমা
চাইবে। বৃষ্টিকে একবার দেখতে
চাইছে। প্রথমে নদী একদমই না করে
দিয়েছিল। কিন্তু মামা বললেন, বৃষ্টি
আসুক, তারপর সিদ্ধান্ত নিস।

নদীর এখন মনে হয় বৃষ্টি অনেক
বড়ো হয়ে গিয়েছে। কত বুদ্ধি রাখে।
মেয়ের কথাতেই ফের একবার
শ্বশুরবাড়িতে আসা। মেয়ে বলেই
রেখেছে বিষয় সম্পত্তি কোনোও কিছুই
ও নেবে না। যার খুশি নিয়ে নিক।

আনন্দহীন বাড়িটায় অপূর্ব আর ওর
বউ এসে নদীকে ভেতরে নিয়ে গেল।
অপূর্ব বৃষ্টিকে বলল, আয় চল এটা
তোদেরই বাড়ি। তোর পায়ের নীচের
মাটি, মাথার উপরে ছাদ। তারপর নদীর
দিকে তাকিয়ে বলল, একেবারে শেষ
সময়ে হলেও এসেছ। হয়তো আর
বেশিক্ষণ নেই। পরের দিকে নীহার খুব
স্মোক করত, তাই হয়তো লাং
ক্যানসারে ভুগছে। কাল থেকেই শ্বাস
উঠেছে। ডাক্তার বলে দিয়েছে খবর
দেবেন, ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দেবো।
কথাটা শুনে কি বুকে ধাক্কা লাগল
নদীর। ও তো এমন জীবন চায়নি।
নীহারের সঙ্গেই সংসার গড়ার স্বপ্ন
দেখেছিল। জীবনের শত্রুপথে চলা
নদীর অনেক অভিমানেই কি চোখ
ভিজে হয়ে আসছে?

বৃষ্টি দেখল নীহারকে নীচের একটা
ছোটো ঘরে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

রোগে ভুগে শরীর কঙ্কালের মতো
শীর্ণ। দেহে প্রাণ আছে কিনা বোঝাই
যাচ্ছে না। মাথাটা অন্য দিকে হেলানো,
তাই মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।
তবে গাল ভর্তি বিশাল সাদা দাড়ি, চুল
আর অযত্নের ছাপ সর্বত্র। বিছানায়
কোনো তোষক নেই। গায়ের চাদরটা
কী ময়লা। শরীরটা কত ছোটো হয়ে
এসেছে। বৃষ্টি সেদিকে একদৃষ্টে
তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মনের
ভেতর কি কোনও তোলপাড় হচ্ছে?

অপূর্ব বলেছিল নদীর কাছে ক্ষমা
চাইবে নীহার। কিন্তু ওর আর কি সেই
চেতনা আছে? মেয়েকে আকুল হয়ে
দেখতে চেয়েছিল সব কি দেরি হয়ে
গেল? তাছাড়া নদীর কাছে ক্ষমা চেয়ে
কী হবে। নদীর সেই দিনগুলি কি ফিরে
আসবে। নীহারের ঘরে না গিয়ে
ওপরের নিজের ঘরে গিয়ে থমকে গেল
নদী। কত বছর পর এই বাড়িতে এই
ঘরে পা রাখল ও। তার হিসেব আর
এখন কষতে চায় না। সম্ভবত
শেষবারের মতো নিজের ঘরটায়
এসেছে। ঘরের আসবাবগুলো
অনেকটা আগের মতোই আছে। তবে
ধুলো ময়লা পড়ে রং উঠে গিয়ে প্রায়
সাদা হয়ে গিয়েছে। তবে ওরা আসবে
বলেই হয়তো ঘর কিছুটা পরিষ্কার করা
হয়েছে। ভাবছিল ঘরে পাতা এই
খাটেই ফুলশয্যার রাতে ওকে ফুলের
সজ্জায় ঢেকে বসানো হয়েছিল।
সেইরাত মোটেই সুখের ছিল না। কত
স্মৃতি ভেসে আসছে। যেন আজ সেই
রাতের রজনীগন্ধার গন্ধ অনুভব করছে
ও। সেই রাতের মতো ঘরের বাইরে
হালকা কোলাহল, সানাইয়ের শব্দ,
রান্নার গন্ধ আসছে। রাত বাড়ছে,
অতিথিরা বিদায় নিয়েছে, আত্মীয়রা
বাসরের তোড়জোড় করছে। বিরক্ত
মুখে নীহার বসে রয়েছে।

আজ যেন সেই রজনীগন্ধার গন্ধে
 গা গুলিয়ে উঠল। এই ঘরে নীহারকে
 আপন করে পেতে চেয়েছিল বলে
 অপমান জুটেছিল। নারায়ণপুর থেকে
 নীহারের আসার দিন ঘর গুছিয়ে
 রাখত, তাই নিয়ে শাশুড়ি কত গঞ্জনা
 দিয়েছে। সাজানো ঘর উলোট পালট
 করেছে। নীহার নদীর চোখের জলের
 মূল্য দেয়নি। ওর লাগানো ফুলের কত
 গাছ পা চাপা দিয়ে মেরেছে। ঘরের
 ভেতর রাখা ছোটো ছোটো ফুলের টব
 বাইরে ফেলে দিয়েছে। ঘরের জানালা
 দিয়ে দূরের মানসাই নদীটার দিকে
 তাকালো ও। মনে হলো সেই নদীটা
 একই রকম আছে। কতবার দূর থেকে
 ওই মানসাই নদীকে মনের কথা
 বলেছে। এই নদীর চোখের জলে
 মানসাই নদীর বুক উথলা হয়েছে কিনা
 জানে না ও। সেই বড়ো স্রোতস্বিনী এই
 ছোটো নদীর বৃষ্টিধারায় হয়তো
 মিশেছে। ও ভাবছিল কীসের টানে

এখানে এল। না এলে ক্ষতি কী ছিল।
 সেই অনেক দিন আগে হয়তো এমনই
 দিনে নদী এই বাড়িতে এসেছিল।
 সারাটা জীবন এই বাড়িতে থাকবে
 এমনটাই তো হওয়ার কথা ছিল। আজ
 অনেক দিন পরে যৌবনের প্রাপ্তে এসে
 এই প্রত্যাবর্তন শ্বশুরবাড়ির ভিটা
 নদীকে বরণ করেছে কিনা ও জানে
 না। নববধূকে লক্ষ্মীরূপে কল্পনা
 করে ঘোড়শোপচারে প্রদীপ জ্বালিয়ে
 বরণ করা হয়। হায় রে, লক্ষ্মীহীনা
 নারী ভাবলেই চোখে জল ভরে
 যায়।

এসব ভাবনায় জোর ধাক্কা লাগল
 বৃষ্টির চিৎকারে—ও মা তুমি কোথায়

গেলে। শিগগির এসো বাবা আর শ্বাস
 নিচ্ছে না। বৃষ্টি জোরে জোরে
 ডাকছিল—বাবা, বাবা ও বাবাগো।
 বৃষ্টির গলা কি ধরে এলো! নদী সিঁড়ি
 দিয়ে নামতে নামতে ভাবল সারা জীবন
 সন্তানের কাছ থেকে বাবা ডাক শুনেবে
 বলে মানুষটা হয়তো আকুল হয়ে
 অপেক্ষা করেছে। সন্তানকে দেখতে
 চেয়েছে সেই আশা আর পূরণ হলো
 কোথায়? বৃষ্টির মুখে এমন বুক
 ফাটানো বাবা ডাক শুনে প্রথমে নদী
 চমকে গিয়েছিল। তারপর ভাবল বৃষ্টি
 নিজেকে পরিবর্তন করে বাবা ডেকে
 সেই মানুষটাকে অবশেষে স্বীকৃতি দিয়ে
 গেল। □



সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়



Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees

160, Jamunalal Bazaz Street,
2nd Floor,

Kolkata-700 007

(s) 2272-5487

Mob : 9331105467

With Best Compliments

from -

A

**Well
Wisher**

শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা কামনায় :-



A

Well Wisher

(KN3)



বিবেক আলোকে আলোকিত সুভাষ

ড: পঙ্কজ কুমার রায়

১৮৯০ সালে বরাহনগরের এক পোড়োবাড়ি থেকে বারাণসী, হরিদ্বার, হাথীকেশ, আলমোড়া, খেতড়ি হয়ে ওরিয়েন্ট জাহাজে চেপে শিকাগো ধর্মহাসভায় বক্তৃতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন বিবিদিষানন্দ ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ। পাশ্চাত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির জয়ধ্বজা উত্তোলন এবং সনাতন ধর্মের ওজস্বী বার্তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার পর স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। সাত বছর পর ১৫ই জানুয়ারি, ১৮৯৭ বিলেত থেকে ফেরার পথে প্রথমে কলম্বো, সেখান থেকে জাফনা হয়ে রামনাদের ভারত-ভূখণ্ডে পদার্পণ করেন। সঙ্গে বিদেশি শিষ্য, বক্তৃতার অনুলেখক গুডউইন, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী, আরও অনেকে। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে জাতীয় পুনর্নির্মাণের জন্য যুব সমাজকে আহ্বান করলেন। ‘কলম্বো থেকে আলমোড়া’ ভাষণে তার অভিঘাত লক্ষ্য করা যায়।

চেন্নাইতে প্রদত্ত ‘ভারতের ভবিষ্যৎ’ বক্তৃতায় স্বামীজী বললেন, “আগামী পঞ্চাশ বৎসর গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোনো ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতা ঘুমাইতেছেন, তোমার স্বজাতি এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত— সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন।” ঠিক ৫০ বছর পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমরা ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস পেলাম। ১৯২৮ সুভাষচন্দ্র ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের বিরোধিতা করে পূর্ণ স্বরাজের দাবি করেছিলেন।

আবার ১৯২৯ সাল। গান্ধীজী পূর্ণ স্বরাজের দাবি করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র সমান্তরাল সরকারের দাবি পেশ করেন। যদিও দুটি অধিবেশনে গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব নয়। ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে স্বামী বিবেকানন্দ জাফনার ‘হিন্দু কলেজ’ প্রাঙ্গণে বেদান্ত সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, “প্রাচীন পারসীকদের বিকৃত উচ্চারণে ‘সিন্ধু’ শব্দই ‘হিন্দু’ রূপে পরিণত হয়; তাঁহারা সিন্ধুনদের অপরতীরবাসী সকলকেই ‘হিন্দু’ বলিতেন। এইরূপে ‘হিন্দু’ শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে;..... অতএব, আমি হিন্দু শব্দ ব্যবহার করিব না। তবে কোন শব্দ ব্যবহার

করিব? আমরা ‘বৈদিক’ শব্দটি ব্যবহার করিতে পারি অথবা ‘বৈদান্তিক’ শব্দ ব্যবহার করিলে আরও ভালো হয়।

যদিও তিনি বিশ্বধর্ম সম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিন-তিনবার সে কথা কন্সকুর্থে ধ্বনিত হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩। (২)

১৮৯৭ সালে রামনাদে অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী বললেন, “হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে, এখন ঘুমাইবার সময় নয়। আমাদের কার্যকলাপের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ওই দেখ, ভারতমাতা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। তিনি কিছুকাল নিদ্রিতা ছিলেন মাত্র। উঠো, তাঁহাকে জাগাও—আজ নূতন জাগরণে নূতন প্রাণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমণ্ডিত করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে তাঁহার শাস্ত্র সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর। (৩) সুভাষচন্দ্র বসু বলতেন, “মানব জাতির সেবা ও আত্মার মুক্তি, এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ।”

সুভাষচন্দ্র মাত্র পনেরো বছর বয়সে বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পড়তে শুরু করেন। তিনি লিখেছেন, “আমার বয়স মাত্র পনেরো বছর যখন বিবেকানন্দ আমার জীবনে প্রবেশ করিলেন.....” সুভাষচন্দ্র প্রথমে আত্মীয়ের বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা কয়েকটি বই দেখেছিলেন। তিনি সেই বইগুলি চেয়ে এনেছিলেন। বইগুলি তিনি পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পড়া শুরু করেন এবং খুব শীঘ্রই সেই সমস্ত বই পড়া শেষ করেন। তিনি লেখেন, “সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ধারণা কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। ‘স্বাধীনতা, স্বাধীনতা আত্মার গান—এই বার্তাটি স্বামীজীর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে এসে সমগ্র জাতিকে মোহিত এবং প্রায় উন্মাদ করে তুলেছিল। এই সত্যটি তাঁর রচনা, জীবন, কথোপকথন এবং বক্তৃতাগুলিতে মূর্ত ছিল।^৪ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য। জনসেবার মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির ধারণা নেতাজী স্বামীজীর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথায়, “ধর্মচর্চা বলতে আমি শুধু যোগ অভ্যাসকেই জানতাম, একথা বললে ভুল বলা হয়। অবশ্য কিছুদিন আমি যোগ নিয়ে একটু বেশিরকম মেতে উঠেছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলাম আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জনসেবা অপরিহার্য। এই ধারণা বিবেকানন্দই আমাকে দিয়েছিলেন। তিনিই জনসেবা, তথা দেশসেবার আদর্শ প্রচার করেছিলেন।” তাইতো তিনি বলতে পারেন,—

“বহুদূরে সম্মুখে, তোমার
ছাড়া কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।”

সুভাষচন্দ্র ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মাবকাশে ভারত ভ্রমণে বের হন।

অনেক মন্দির দর্শন ও সাধুসঙ্গ করার পর তিনি বারাণসীতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সান্নিধ্যে এসে শান্তি লাভ করেন এবং ঋষিতুল্য জীবনবোধ উপলব্ধি করেন। স্বামীজীর বাণী নেতাজীর ভিতরে কীভাবে অনুরণন ঘটিয়েছিল ২০১৩ সালে প্রকাশিত The Salute সংকলনে উল্লেখ করা হয়। “I was barely fifteen when Vivekananda entered my life. Then there followed a revolution within and everything was turned upside down. It was of course, a long time before I could appreciate the full significance of his teachings, or the greatness of his personality, but certain impressions were stamped indelibly on my mind from the outset... Many of the questions which vaguely stirred my mind, and of which I was to become conscious later on, found in him a satisfactory solution.”^৫

ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্র গুরু স্বামীজী সম্পর্কে বলেছিলেন, “বিবেকানন্দের কথা বলতে গেলে হারিয়ে ফেলি নিজেকে। কে বুঝবে তাঁকে, কে বুঝবে তাঁকে? অসম্ভব। সুগভীর তিনি। জটিল, ঋদ্ধমান। ত্যাগে বেহিসেবী। কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন, জ্ঞানে সমুদ্রগভীর, সমালোচনায় অগ্নিবর্ষী। আর সারল্যে শিশু—একেবারে শিশু—এ জগতে তাঁর তুল্য নেই, কেউ নয়..... আমি কে, যে বলব তাঁর কথা?” ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লেখেন, “একজন তপস্বী হলেও বিবেকানন্দ ছিলেন দেশপ্রেমিকদেরও একজন দেশপ্রেমিক। ভারতের জনগণের মধ্যে সুপ্ত কিন্তু মৃত নয় এমন আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তির পুনরুজ্জীবিত করে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক গৌরব পুনরুদ্ধারের চিন্তাভাবনা সর্বদা তাঁর মনের সবচেয়ে উচ্চতম চিন্তা ছিল.....”^৬

১১ই পৌষ, ১৩৩২ (১৯২৫) ‘দেশের ডাক’-এ সুভাষচন্দ্র বলেন, “বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছো, এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মতো গ্রহণ করতে পার তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন।”^৭ ১৯২৯ সালে রংপুরে রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, “It was Swami Vivekananda who gave a new turn to the history of Bengal as he repeatedly said that man-making was his mission in life.”^৮ ধর্মবোধ নেতাজীর রাজনীতির ভিত্তি তা ‘দেশের ডাক’, ‘তরুণের স্বপ্ন’-এ প্রতিভাত হয় নিজের কথায় ও গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি।^৯ স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন “Man making is my mission.”

সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশের আরও অনুমতি প্রার্থনা করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে চিঠি লেখেন। তরুণের স্বপ্নে তার উল্লেখ আছে—

“..... আপনি বাংলাদেশে স্বদেশ সেবায়জ্ঞের প্রধান ঋত্বিক— তাই আপনার কাছে আমি উপস্থিত হয়েছি—আমার যৎসামান্য বিদ্যা, শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে, মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার মতো আমার কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর।

.....আমি আজ প্রস্তুত—আপনি শুধু—কর্মের আদেশ দিন” ১০ একই সঙ্গে Secretary of State for India-কে পত্র লিখে £100 (১০০ শত পাউন্ড) ফেরত দেন ২২শে এপ্রিল, ১৯২১।

রাজনৈতিক ঋষি সুভাষচন্দ্র সম্মাসী স্বামীজীর প্রেরণায় এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়, বিবেকানন্দ ছিলেন নব ভারতের নবযাত্রী।” কটক থেকে বাল্যকালে ‘মাতা ঠাকুরাণী’কে লেখা পত্রে দেশমাতৃকা ও ধর্ম সাহিত্যের বীজ তাঁর অন্তরে গ্রথিত থেকেছে তার প্রকাশ পাওয়া যায়।

“মা, ভারতবর্ষে ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্ট ধরণীকে পরিব্রাজ্য করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ।”

আপনার ছেলে
সুভাষ^{১১}

২৫ অক্টোবর, ১৯২৪ সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৫ জানুয়ারি, ১৯২৫ বার্মার মান্দালয় জেলে স্থানান্তর করা হয়। সেই বছর দুর্গাপূজায় সুভাষচন্দ্র বন্দিদের নিয়ে জেলে অনশন করেন দুর্গাপূজা করার দাবিতে। অবশেষে মান্দালয় জেলে ব্রিটিশ সরকার দুর্গাপূজা করার অনুমতি ও অর্থ বরাদ্দ করে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা শুরু করেন। কী আশ্চর্য মিল গুরু-শিষ্যের! সুভাষের মান্দালয় জেলে দুর্গাপূজার শতবর্ষ আর স্বামীজীর বেলুড়মঠে দুর্গাপূজার ১২৫ বছর উদ্‌যাপন হবে ২০২৫ সালে।

১৯৪১ সালের ১৬-১৭ জানুয়ারি রাতে নেতাজীর মহানিষ্ক্ৰমণ ঘটে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে। মহানিষ্ক্ৰমণের আগে ভাইবী ইলা বসুকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠিয়ে ভবতারিণীর পূজা দিয়ে প্রসাদ ও প্রসাদী ফুল আনিয়ে তিনি ‘অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য’ তিমির রাত্রি পাড়ি দিয়েছিলেন।

স্বামীজী ভারতের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত আর নেতাজী রাজনৈতিক। পৃথিবীর বৃক্ক বঙ্গ তথা বাঙ্গালির গুরু-শিষ্য পরম্পরা ভারতকে ‘ধর্মে মহান’ ও ‘কর্মে মহান’ হবার প্রেরণা দিয়েছে।

আমাদের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন—“যদি ভারতকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জান। তাঁর সবই ইতিবাচক এবং কিছুই নেতিবাচক নয়।” নেতাজী স্বামীজীর ভাবশিষ্যরূপে তা জেনেছিলেন বলেই ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার’ পার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এটলি। ১৯৫৬ সালে রাজভবনে তৎকালীন গভর্নর স্যার ফণিভূষণ চক্রবর্তী এটলিকে প্রশ্ন করেছিলেন দুশো বছর শাসনের পর দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত পরিত্যাগ করল কেন ব্রিটেন? এটলির সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল : সুভাষচন্দ্র।

২৭ শে মাঘ, ১৩৩৫ পাবনা যুব সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন,

“যে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা ও নতুন প্রেরণা নাই, সে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন তরুণের প্রতিষ্ঠান বা তরুণের আন্দোলন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।”^{১২}

পাবনা সম্মেলনে দৃষ্টকণ্ঠে স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা সহকারে বলেন—“আমরা যদি দেশকে ভালবাসিতে শিখি তাহা হইলে আত্মবলিদানের ক্ষমতা লাভ করিব। আমাদের চরিত্রে অবিরাম ও অশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা (tenacity of purpose) ফিরিয়া আসিবে। এই দুইটি বল tenacity of purpose বা moral stamina কোথায় পাইব? বনেজঙ্গলে যুগযুগান্তর তপস্যা করিলেও পাইব না। পাইব নিষ্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢালিয়া দিলে, অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হইলে। ঘরের কোণে বসিয়া উপাসনা করিলে, সংসার ত্যাগ করিলে, সম্মাস গ্রহণ করিলে সাধনা বা শক্তি সঞ্চয় হয় না। শক্তিপূজা কথার কথা নয়, যদি কথার কথা হতো তবে চিরদিন ভারত শক্তিপূজা করে শক্তিহীন কভু হতো না।”

সাধনার স্বরূপ তাই স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এভাবে :

“পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।/চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।”

“এই কর্ম-সংগ্রামে অবিরতভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে শক্তিশালী হইবে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর স্বাধীন জাতিরা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের তরুণ সমাজ এই পথে চলুক; তাহা হইলে আমরা ফিরিয়া পাইব ভারতের লুপ্ত গৌরব, ফিরিয়া পাইব আমাদের প্রাচীন বিভব, ফিরিয়া পাইব আমাদের স্বাধীনতার ঐশ্বর্য আর বিশ্বের এই মুক্ত প্রাঙ্গণে আবার শির উন্নত করিয়া মানুষের মতো চলিতে শিখিব।”^{১৩}

মান্দালয় জেল থেকে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির অন্যতম কর্মী শ্রীমান হরিচরণ বাগচীকে লিখছেন,

“সাধনার একদিক রিপু ধ্বংস করা। অপরদিকে সদবৃত্তির অনুশীলন করা। রিপুর ধ্বংস হইলেই সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে,

শান্তিও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে।

সত্য (সম্ভব হইলে) দুইবেলা এইরূপ ধ্যান করিবে। কিছুদিন ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে, শান্তিও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে।

আপাতত স্বামী বিবেকানন্দের এই বইগুলি পড়িতে পার। তাঁহার বইয়ের মধ্যে ‘পত্রাবলী’ ও বক্তৃতাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। ‘ভারতে বিবেকানন্দ’ বইয়ের মধ্যে এসব বোধ হয় পাইবে। আলাদা বইও বোধ হয় পাওয়া যায়। ‘পত্রাবলী’ ও বক্তৃতাগুলি না পড়িলে অন্যান্য বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। ‘Philosophy of Religion’, ‘Jnan Yoga’ বা ওই জাতীয় বইতে আগে হস্তক্ষেপ করিও না। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’ পড়িতে পার। রবিবাবুর অনেক কবিতার মধ্যে খুব inspiration পাওয়া যায়। ডি এল রায়ের অনেক বই আছে (যেমন ‘মেবার পতন’, ‘দুর্গাদাস’) যা পড়িলে বেশ শক্তি পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর ও রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও খুব শিক্ষাপ্রদ। নবীন সেনের ‘পলাশীর যুদ্ধ’ও পড়িতে পার।”^{১৪}

স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, “If you want to know India, study Vivekananda. In him everything in positive and nothing negative.” অন্যদিকে ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেন, “full blooded masculine personality and a fighter to the core of his being.” সুভাষচন্দ্র মনে করতেন, স্বামীজী একজন পূর্ণাঙ্গ পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্ব এবং তার সত্তার মূলে একজন যোদ্ধা বলে অভিহিত করেছিলেন। (চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ২০১২)

১৯৩৯ সালের ১৯ আগস্ট (২রা ভাদ্র, ১৩৪৬) রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদনের উদ্বোধনে বলেন “বাঙ্গলায় যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস-বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি” (মহাজাতি সদনের ফলকে আজও যা খোদিত আছে)। সুভাষচন্দ্রকে পাশে বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি সদনের উদ্বোধন করেছিলেন। বাঙ্গলার জাগ্রত মনীষিতাকে অভ্যর্থনা করেছেন।

মাঘ, ১৩৪৫ কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্রকে তাসের দেশ উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, “স্বদেশের চিন্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে, তোমার নামে ‘তাসের দেশ’ নাটকটি উৎসর্গ করলুম।”

রামকৃষ্ণের ১৮৫ তম জন্মজয়ন্তীতে আলোচনায় উঠে আসে সোনার চেয়েও খাঁটি দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সম্পর্ক। সুভাষ বিবেকানন্দের সমগ্র পড়ে অনুপ্রাণিত হন এবং ফলিত বেদান্তের আলোকে দরিদ্র, অসহায় ও আর্ত মানুষের সেবায় মনোনিবেশ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের

সম্পর্কে আসবার আগে সুভাষচন্দ্র রামকৃষ্ণ কথামৃত (The Gospel of Sri Ramakrishna) পাঠ করে মাতা প্রভাবতী দেবীকে লেখেন, “জীবনের লক্ষ্য হইল ঈশ্বর লাভ।” যদিও তরুণ সুভাষ বিবেকানন্দের গতিময় ব্যক্তিত্ব এবং বিবেকানন্দকে জানবার পর ‘কথামৃত’ আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করেন। সুভাষচন্দ্রের কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান রণিত হয়েছেঃ “From Vivekananda I turned gradually to his master, Ramakrishna Paramahansa. Vivekananda had made speeches, written letters, and published books which were available to the layman. But Ramakrishna, who was almost an illiterate man, had done nothing of the kind. He had lived his life and had left in to others to explain it. Nevertheless, there were books or diaries published by the disciples which gave the essence of his teachings.... There were nothing new in his teaching, which is as old as Indian civilization itself, the Upanishads having taught thousands abandonment of worldly desires alone can immortal life be attained. Effectiveness of Ramakrishna’s appeal lay, however, in the fact that he had practised what he preached and that he had reached the acme of spiritual progress.” (netajisubhasbose.org; March 21, 2021.)

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ‘সমকালীন ভারতে সুভাষচন্দ্র’ পুস্তকে লিখলেন, “মনে রাখতে হবে, সুভাষচন্দ্র নিছক তাত্ত্বিক মানুষ ছিলেন না। দর্শনের এই উত্তম ছাত্রের তাত্ত্বিক হয়ে ওঠার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তত্ত্বকে বিলাসবস্ত্র না করে জাতীয় জীবনে তিনি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। আবার সুভাষচন্দ্র শুধু বিদ্রোহী দেশকর্মী নন, তাঁর সকল কর্ম সুগভীর জীবন দর্শনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; সেই জীবন দর্শন পৃথিবীর প্রাচীন বা আধুনিক নানা দর্শনের সমাহার এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধির আলোকে সংগঠিত হয়েছে।” (জেনোরিক, ২০২৩)

১৯২৪ সালে সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনের CEO হবার পর তাঁর সেবাকার্য আরও ব্যাপ্ত হয়। ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গের বন্যায় ভ্রাণবন্টন সমালোচকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২৪ সালে Ramkrishna Mission Student’s Home পরিদর্শন করে স্বামী নির্বেদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লেখেন, “I visited the Ramakrishna Mission Students’ Home a few days ago and was exceedingly pleased with what I now....the fact that a serious attempt is made here to impart moral and religion instruction as also to make students live a good and pure life, is a further reason why I am interested in the success of this institution.”^{১৫}

সুভাষচন্দ্র বেলুড়মঠে যেতেন কিনা তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ হরিবিষ্ণু কামাখা যিনিও ICS ত্যাগ করেছিলেন তিনি দু’মাস সুভাষের সঙ্গে কলকাতায় ছিলেন। তিনি দেখতেন মধ্যরাতে সুভাষচন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যেতেন

ধ্যান করতে। তিনি বেদান্ত আন্দোলনের কাণ্ডারি স্বামী অভেদানন্দের সংস্পর্শে আসেন এবং অভেদানন্দ আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করে বলেন ‘be thou victorious’.(বিজয়ী হও)। সুভাষচন্দ্র বুদ্ধ মহারাজ অর্থাৎ স্বামী ভাস্করানন্দজীর সাক্ষাৎ করতে যান সিঙ্গাপুরের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে। তিনি মধ্যরাত্রে ধ্যান করতে যেতেন, সারদাদেবীর তিথিপূজায় অংশগ্রহণ করতেন। ব্রিটিশরা পুনরায় সিঙ্গাপুর অধিকার করলে বুদ্ধ মহারাজ ও ব্রহ্মচারী কৈলাশমকে সুভাষের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সাংস্কৃতিক সন্ন্যাসী আর সুভাষচন্দ্র ছিলেন রাজনৈতিক সন্ন্যাসী। সমকালে এই যুগল-বন্ধন বড়ো বিরল। একদিকে, বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতবাসীর মন, বুদ্ধি, বিবেক ও চরিত্র গঠনের কাণ্ডারি। অন্যদিকে, সুভাষচন্দ্র ছিলেন সেই আদর্শকে রাষ্ট্রহিত ও ভারতবাসীর রাষ্ট্রচেতনাকে জাগ্রত করে স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণের কারিগর।

স্বামীজীর স্মরণিত কবিতা ‘ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়’-এর প্রথম স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা যাক,
 “সূর্য যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় কিছুক্ষণ
 যদি বা আকাশ হের বিষণ্ণ গম্ভীর,
 ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়,
 জয় তব জেনো সুনিশ্চিত।”

স্বামী সুবীরানন্দজী মহারাজ ‘সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনে স্বামীজীর প্রভাব’ প্রবন্ধে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

“পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পস্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী।
 হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।”

নেতাজীর জীবনে বিবেকানন্দ এই অনশ্বর, অবিচল চিরসারথি যিনি সেদিনের ধূলিধূমসমাকীর্ণ সভ্যতার বিবর্ণ বন্ধুর রাজবীথিপথে লক্ষ কোটি মানবজাতির মিছিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাদেরই যাত্রার অধিনায়করূপে। অনাগত বিশ্বসংসারের দুর্গম পথে, সহস্র-সহস্র শোক-তাপ-বিরহ-দহনের বহিঃশুদ্ধি আত্মীকৃত করে বিবেকানন্দই সুভাষকে তাঁর অমোঘ কিন্তু অদৃশ্য আকর্ষণে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন নবযুগের ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ‘লোভ-দানবের ক্ষুধিত নেত্রের সামনে’।^{১৬}

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ‘সুভাষচন্দ্রের অন্তর্লোকে বিবেক-বাণীর জয়যাত্রা’ প্রবন্ধে যথাযথই বলেছেন, “সুভাষ জানতেন অনেক মরণ পেরিয়ে তাঁকে হাঁটতে হবে, অনেক শত্রুর ফাঁদ পায়ে-পায়ে ছিঁড়তে হবে, ডাক দিতে হবে ভারতের বীর্যকে, নাশ করতে হবে ভারতের ক্রৈব্যকে—সুভাষচন্দ্রকে নেতাজী হতে হবে—সঙ্গে স্বামীজী আছেন যে। সত্যই তাই, ভারত ইতিহাসের বহু শতাব্দীর মৃত্যু-নদীর উপর বিবেকানন্দ একটি সহস্রদল রক্তপদ্ম ভাসিয়ে দিয়েছিলেন—সেই

পদ্মটিই সুভাষচন্দ্র— মৃত্যুর স্নানে ভারতভূমির জীবনকে শুচি ও অমৃত করে তুলতে এসেছিলেন।^{১৭} বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে সুভাষচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতা, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা উদ্ভাসিত।

(৭ মে, ২০২৫ ওমেস কলেজ,বাগবাজারে এই প্রতিবেদকের প্রদত্ত ভাষণ)।

তথ্যসূত্র

- ১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ১৫৩।
- ২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮১, পৃঃ ১১-১২।
- ৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ৩৫।
- ৪। বিবেকানন্দ ও লোকেশ্বরানন্দ, ১৯৯৬, পৃঃ ২০৯-২১২।
- ৫। The Patriot and His Inspiration, A Salute. EMTA, Coal Limited, 2013
- ৬। বিবেকানন্দ ও লোকেশ্বরানন্দ, ১৯৯৬, পৃঃ ২২২-২২৩।
- ৭। দেশের ডাক, তরুণের স্বপ্ন, ১১ই পৌষ ১৩৩২ (১৯২৫) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৪৫, আনন্দ, ষড়বিংশ মুদ্রণ, মে ২০২৩, পৃ. ১২ ISBN 9788170666578.
- ৮। Important Speeches and Writings of Subhas Bose, Edited by J. S. Bright, Lahore, 1946.
- ৯। তরুণের স্বপ্ন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, আনন্দ, ষড়বিংশ মুদ্রণ মে, ২০২৩, পৃঃ ১১।
- ১০। তরুণের স্বপ্ন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৪৫ আনন্দ, কলকাতা প্রবাহ ষড়বিংশ মুদ্রণ, মে ২০২৩, পৃঃ ২ এবং ৩ ISBN 9788170666578
- ১১। Letter to his mother as a boy in Cuttack, describing India as “God’s beloved land”, A Salute, EMTA Coal Limited, 2013
- ১২। যুব আন্দোলন, তরুণের স্বপ্ন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, আনন্দ ষড়বিংশ মুদ্রণ, মে ২০২৩, পৃ. ১১৪।
- ১৩। তদেব, পৃ. ১১৯
- ১৪। তদেব, পৃ. ৩১
- ১৫। netajisubhasbose.org, March 4, 2021
- ১৬। সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনে স্বামীজীর প্রভাব, স্বামী সুবীরানন্দ, বিবেক-দ্যুতিতে উদ্ভাসিত সুভাষচন্দ্র, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, প্রকাশ ২৩ জানুয়ারি, ২০২২ পৃঃ ১৩।
- ১৭। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্লোকে বিবেকবাণীর জয়যাত্রা, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, তদেব, পৃঃ ৭।

(লেখক অধ্যক্ষ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ)

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

MAZZA DENIM

Incense Sticks

Now you can capture the beauty of
an experience light-up and unfold a
thousand petals.

Shashi Industries
Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

*With Best Compliments
From-*



**S. K.
KAMANI**

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor,
Room No. 3-A)
2, Ganesh Chandra Avenue
Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Manufacturers of

Autoply[®] BRAND

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable,
PVC Tape, Wiring Terminal
and Auto Electrical parts

Kasat Marbles

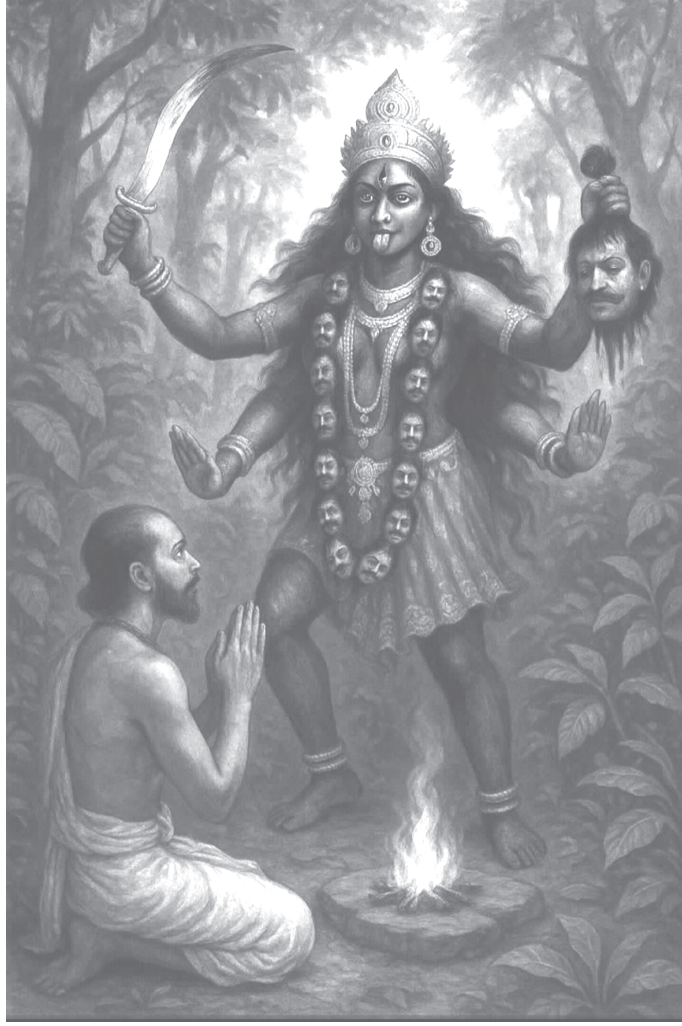
19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947
Deals in : Marble, Granites Tiles,
Ceramic Tiles, Stone etc.

Authorised Dealer of
KAJARIA CERAMICKS LTD.
'NAVEEN' brand tiles
REGENCY CERAMICES LTD.
BELLS CERAMICES LTD.
ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. Kolkata - 53
Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
Godown : 2403-4014



বঙ্গদেশে শক্তি সাধনায় অগ্রগণ্য সাধক পূর্ণানন্দ গিরি

প্রবীর ভট্টাচার্য

বহুদিন আগের কথা। কামাখ্যার পথে চলেছেন এক বঙ্গ তনয়। ক্ষীণকায় কিন্তু অসীম সাহসী। গুরুকে শাপমুক্ত করতে দুর্গম পথ পেরিয়ে চলেছেন কামাখ্যা মন্দির সংস্কারের কাজে। কামাখ্যা মহাপীঠ ছিল সেযুগে দুর্গম ও জঙ্গলাকীর্ণ। পীঠস্থানটির অবস্থান সাধারণের কাছে ছিল অগম্য। কারণ দীর্ঘ সময় ধরে দেবীপূজা বন্ধ। কালাপাহাড় নামে এক দস্যু গোমাংস নিষ্ক্ষেপ করে এই মন্দিরকে অপবিত্র করে। এখন উপায়! পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন সারা ভারতবর্ষ থেকে মাতৃ

সাধকদের এনে যাগযজ্ঞ করে দেবীকে জাগ্রত করতে হবে। বড়ো কঠিন এই কাজ। সেই শুদ্ধীকরণ যজ্ঞেই চলেছেন এই বঙ্গবাসী ব্রহ্মচারী জগদানন্দ। গুরুপ্রদত্ত নাম পূর্ণানন্দ। ভবিষ্যতে এই যুবকের প্রভাবেই বঙ্গদেশে শক্তিপূজার প্রাবল্য আসবে। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা।

একাল শক্তিপীঠের অন্তত পনেরো-ষোলটি শক্তিপীঠ বঙ্গদেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে। এছাড়াও আছে অনেকগুলি সিদ্ধপীঠ। সতীর দেহাংশ সত্যই এই অঞ্চলে পড়েছিল কিনা সে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি না করে এমন ভাবাই যেতে পারে যে দীর্ঘ সময় ধরে বঙ্গদেশের মাটি শাক্তসাধকদের সাধনক্ষেত্র। বঙ্গদেশের ধূলিকণায় এমন শক্তি আছে যা সাধকদের যুগ যুগ ধরে উদ্দীপ্ত করেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যেখানে বঙ্গদেশের মাটির নাম জড়িয়ে আছে, এর ৮১-৯৩ অধ্যায়ের ‘শ্রী শ্রী চণ্ডী’ অংশটি হলো দেবী আরাধনার অন্যতম অংশ। অন্যদিকে এই মার্কণ্ডেয় পুরাণের সঙ্গে ব্যাসদেবের নাম জড়িয়ে থাকায় কেউ কেউ মনে করেন এর রচনাকাল মহাভারতের সময়কালেও হতে পারে। ‘বেদ’ আগে না ‘তন্ত্র’ আগে এ বিষয়েও বিতর্ক রয়েছে। তবে বেদের ভাষ্যকারেরা ঋগ্বেদ (১০/৭১/৯) এবং অথর্ববেদে (১০/৭/৪২) তন্ত্রজাতীয় শব্দের উল্লেখ আছে বলে স্বীকার করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ঋগ্বেদ, ঋগ্বেদ, দর্শন ইত্যাদি ছটি ভাগের একটি হলো ‘আগম’। ‘আগম’-এর তিনটি ভাগ। বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত। আগমের অপর নামই তন্ত্র।

মার্কণ্ড পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডী আসলে রাজ্যচ্যুত রাজা সুরথ, সমাধি বৈশ্য এবং মেধস মুনির মধ্যে কথোপকথন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও বিদ্রোহে এই রাজ্যহারা নৃপতি পালিয়ে আসেন এবং একই সময়ে গৃহবিবাদে জেরবার হয়ে সমাধি বৈশ্যও পালিয়ে আসেন। হঠাৎই অরণ্য মধ্যে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায় মেধস মুনির। মুনিবরকে তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন সব হারিয়েও তারা কেন রাজ্য, পরিবার ও পরিজনদের ভুলতে পারছেন না! মেধস মুনি উত্তর দিয়েছিলেন, এই জগৎ মায়া ও মোহ দ্বারা আবৃত এবং মহামায়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ‘কে এই মহামায়া’, এই প্রশ্ন করলে মেধস মুনি যা বলেন তাই-ই হলো ‘শ্রীশ্রীচণ্ডী’। বরিশালের সাধক স্বামী বেদানন্দের মতে চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড় সংলগ্ন জঙ্গল হলো সেই স্থান যেখানে কর্ণফুলি নদীর তীরে রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্যের দেখা হয়েছিল। পুষ্পভদ্রা নদী পার হয়ে তারা মেধস মুনির আশ্রমে যান। তবে এবিষয়ে মতান্তর আছে।

চট্টগ্রাম একাল পীঠের এক পীঠস্থান। বেদানন্দের মতে এই সেই স্থান যেখানে মেধস মুনি ‘শ্রীশ্রীচণ্ডী’ তন্ত্র রাজ্যচ্যুত রাজা এবং সমাধি বৈশ্যকে জানিয়েছিলেন। যার থেকে মার্কণ্ডেয় পুরাণে সেই অংশ রচিত হয়। এর থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে বহু প্রাচীনকাল থেকে এই বঙ্গের মাটিতে শক্তি সাধনার ধারার প্রচলন রয়েছে। শোনা যায়, কলকাতার পার্কস্ট্রিট অঞ্চল, যার পুরানো নাম ‘চৌরঙ্গী’, তা চৌরঙ্গীনাথ নামে এক মহাসাধকের

নাম থেকে সৃষ্ট। ইংরেজরা কলকাতা স্থাপনের বহু পূর্বে ঘোর জঙ্গলে পরিপূর্ণ কালীঘাট অঞ্চলে এই সাধক বসবাস করতেন। সেই রকম বশিষ্ঠ, অষ্টাবক্র-সহ নানা পৌরাণিক মুনির নাম তারাপীঠ, বক্রেশ্বরের মতো শক্তিপীঠগুলির লোককথায় যুক্ত হয়ে আছে।

কিন্তু এই চর্চা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আপাতত কামাখ্যা পীঠ সংস্কারে এর ভূমিকার কথা বলা প্রয়োজন। একাল সতীপীঠের অন্যতম এই কামাখ্যা তীর্থ। গুয়াহাটি শহরের পশ্চিম প্রান্তে অবহিমালয়ের নীলগিরি পর্বতে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে এই মন্দির।

কথিত, হিমালয় নরেশ দক্ষ রাজার যজ্ঞ মহাদেব আমন্ত্রিত ছিলেন না। শিবহীন যজ্ঞ কী করে সম্পাদন হয় এ নিয়ে দক্ষকন্যা শিবজয়া সতী পিতাকে প্রশ্ন করলে মহাদেবের প্রতি দক্ষরাজের অসম্মানসূচক মন্তব্যে তীর অপমানে দগ্ধ হয়ে দক্ষরাজ কন্যা সতী দেহত্যাগ করেন। আকস্মিক এই ঘটনায় শোকে উন্মত্ত হয়ে মহাদেব নিজের স্কন্ধে সতীর মৃতদেহ নিয়ে ত্রিলোকে প্রলয় নৃত্য শুরু করলেন। সেই পরিস্থিতিতে সৃষ্টিকে রক্ষা করতে নারায়ণ সুদর্শনকে নির্দেশ দেন সতীর দেহ ছিন্ন করার। সুদর্শনের আঘাতে দেবীর দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভূতলে। যেখানে যেখানে তাঁর দেহাংশ পড়ে সেখানেই এক একটি পীঠস্থান বা শক্তিকেন্দ্র সৃষ্টি হয়। নীলগিরি পর্বতের এই অংশে দেবীর যোনির অংশ পড়ে এক মহাশক্তিকেন্দ্র সৃষ্টি হয়। কথিত, সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব অনন্ত সাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন। মহাদেবের মনে কাম ও প্রেম জাগ্রত করার জন্য দেবতার কামদেবের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। স্ত্রী রতিকে সঙ্গে নিয়ে কামদেব মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করার প্রয়াস নিলে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর ক্রোধাগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হয়ে যান। কামদেবের স্ত্রী রতি কাতর হয়ে মহাদেবের কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইলে মহাদেব বলেন দ্বাপর যুগে ভগবান কৃষ্ণের পুত্র হয়ে কামদেব মদন আবার দেহ ফিরে পাবেন। এদিকে শিবান্নিতে মদনদেবের দেহ বিকৃত ও কদাকার হয়ে উঠেছিল। কামের দেহ বিকৃত হলে নর-নারীর জীবনে অনুরাগ সৃষ্টি হবে কী করে? সৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হবে এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে মদন ও রতি আবার মহাদেবের চরণে পড়লেন, তার পূর্ব চেহারা ফিরিয়ে দেবার জন্য। শিবশঙ্কু দুজনের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন— হিমালয়ের নীলগিরি পর্বতে মহামায়ার আরাধনা করে দেবীকে সন্তুষ্ট করলেই তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। ভোলানাথের পরামর্শমতো কামদেব নীলপর্বতে এসে আদিশক্তির স্তবস্তুতি, পূজা শুরু করলেন। তাঁর কঠোর সাধনায় একদিন মহাদেবী প্রসন্না হয়ে দর্শন দিলেন। কামদেবের প্রার্থনা অনুযায়ী দেবী তাঁকে পূর্ব সৌন্দর্যরূপ ফিরিয়ে দিলেন। এই স্থানে কামদেব তাঁর পূর্ব রূপ ফিরে পেয়েছিলেন, তাই নীলগিরি পর্বতে এই স্থানের নাম হয় কামরূপ এবং আরাধ্যা দেবীর নাম হয় কামাখ্যা। কামদেবের ইচ্ছায় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা এই স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করলেন। মন্দিরগায়ে

চৌষটি যোগিনী মূর্তি-সহ অষ্টাদশ ভৈরবের মূর্তিও নির্মাণ করলেন।

কালিকা পুরাণ এবং রুদ্রায়ামালাতন্ত্রে এই স্থানটিকে শক্তি উপাসনার জন্য নিবেদিত একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈদিক ঋষি বাৎসর্যায়ন খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে নেপালের রাজার দ্বারস্থ হয়ে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলিকে সনাতনীয় প্রথায় ফিরিয়ে আনা এবং তাদের নরবলি প্রথার গ্রহণযোগ্য বিকল্প চালু করার জন্য অনুরোধ করেন। বাৎসর্যায়নের মতে পূর্ব হিমালয়ের গারো পাহাড়ে তারা দেবীর তান্ত্রিক পূজার প্রচলন ছিল। সেখানে জনজাতিরা দেবীর যোনিকে ‘কামাকি’ নামে পূজা করত। সেই হিসেবে কামাখ্যাও মহাশক্তির অংশ হিসেবে পূজিত হন। সপ্তম শতকে গৌড়বঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা শশাঙ্ক দ্বারা এই মন্দির পুনর্নির্মাণের কথা শোনা যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা কালের প্রভাবে মন্দির ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও শক্তি আরাধনা থেকে সনাতনীদের কখনও বিচ্যুত হতে দেখা যায়নি। আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৫৭২ সনে দস্যু কালাপাহাড় বিশাল সৈন্যবাহিনী এনে এই মন্দির ধ্বংস করে ফেলে। গোমাংস নিষ্ক্ষেপ করে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে। প্রাচীনকালে এতদঞ্চলে যতগুলি হিন্দুমন্দির ধ্বংস বা অপবিত্র হয়েছে, অবধারিতভাবেই এই অপকর্মের মূলে উঠে এসেছে কালাপাহাড়ের নাম। বঙ্গ বা কলিঙ্গ দেশেও অসংখ্য হিন্দুমন্দির বা দেবমূর্তি ধ্বংস করেছে এই উন্মাদ।

প্রথম জীবনে এই দস্যু ছিল বারেন্দ্র বংশীয় এক ব্রাহ্মণ সন্তান, কালাচাঁদ রায় বা রাজীবলোচন রায় ভাদুড়ি। সেন যুগে রাজা বল্লাল সেন কনৌজ থেকে আগত ব্রাহ্মণদের বারেন্দ্র অঞ্চলে প্রায় শতাধিক গ্রাম দান করেছিলেন যাতে বৌদ্ধ প্রধান বঙ্গভূমিতে হিন্দুধর্মের বিস্তার হয়। এদের উত্তরপুরুষেরাই বংশপরম্পরায় বঙ্গদেশে জমিদারি ভোগ করে আসছিলেন।

কালাচাঁদ রায়ের পিতার নাম ছিল নয়ানচাঁদ রায়, গৌড় বাদশাহের ফৌজদার। এদের জমিদারি বংশের ইতিহাস একটু জানা দরকার। সে প্রায় সাতশো বছর আগের কথা। তখন বঙ্গদেশ শাসন করছেন দিল্লির বাদশা ফিরোজ শাহ তুঘলক। এদিকে বাঙ্গলার মাটিতে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ দিল্লির শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফন্দি আঁটছে। কিন্তু সমস্যা হলো বাঙ্গলার মুসলিম সৈন্যদের ওপর নির্ভর করে দিল্লির সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব ছিল না। বঙ্গ-বিহার মিলিয়ে সামসুদ্দিনের সৈন্য ছিল মাত্র চৌত্রিশ হাজার। অথচ দিল্লির সুলতানের বিরুদ্ধে লাড়াই করতে হলে বাঙ্গলার প্রভাবশালী ভূস্বামীদের সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন। সামসুদ্দিন সরাসরি প্রার্থনা করেন বারেন্দ্র ভূমির এই জমিদারদের কাছে। সামসুদ্দিন ইলিয়াসকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন শিখীবাহন সাম্যাল ও কৃষ্ণ ভাদুড়ির তিন ছেলে—সুবুদ্ধিরাম, কেশবরাম ও জগদানন্দ। একাদশ শতক থেকে এরা বঙ্গভূমে নিষ্কর জমির অধিকার ভোগ করে আসছিলেন। সমাজে প্রতিপত্তি ও প্রভাব খাটিয়ে এরা সামসুদ্দিনকে পঞ্চাশ হাজার হিন্দু সেনা জোগাড় করে দিলেন। পরবর্তীতে দিল্লির বিরুদ্ধে

যুদ্ধে জয়ী হলে ইলিয়াশ শাহ রাজশাহী অঞ্চলে ভাদুড়ীদের এক বিশাল জমিদারি প্রদান করেন। সেযুগে সুলতানের অধীনে করবিহীন হিন্দু রাজ্যের পত্তন সম্ভব ছিল না। তাই এই পরিবারকে বাৎসরিক মাত্র এক টাকা কর দিতে হতো বাঙ্গলার সুলতানকে। সেই থেকে গৌড়ের দরবারে এরা একটাকিয়া ভাদুড়ী নামে পরিচিত ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাদুড়ীদের জমিদারি দক্ষিণে চলনবিল থেকে উত্তরে দিনাজপুর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং রাজ্যের নাম হয় ভাদুড়িয়া। মুঘল আমলের আগে বারো ভুইয়া বা বারো ভৌমিকদের মধ্যে এরা ছিলেন অন্যতম। খ্রিস্টীয় ১৩৫০ থেকে ১৫৫০ পর্যন্ত এই দুশো বছর এরা রাজত্ব করেন। এই বংশের দুজনের নাম ক্ষণিকের জন্য হলেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন গণেশনারায়ণ বা রাজা গণেশ, যিনি সুলতান প্রথম আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে বাঙ্গলার সিংহাসনে বসেন। দ্বিতীয় যে মানুষটার উল্লেখ প্রয়োজন তিনি হলেন কুখ্যাত কালাপাহাড় বা রাজীবলোচন রায় (ডাকনাম কালাচাঁদ)। পিতা নয়ানচাঁদ রায় ছিলেন সুলতানের একজন ফৌজদার। সে সময় গৌড়ের সুলতান ছিলেন সুমায়মান কররানি। তাঁর কন্যা দুলারী বিবির সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্কে বাঁধা পড়ে রাজীবলোচন। নবাবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কন্যার জেদের কারণে সুলতান এই বিবাহে রাজি হয়ে যান। ইসলাম মতে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ায় রাজীবলোচনকে ধর্ম ত্যাগ করতে হয়, তিনি সমাজচ্যুত হন। এরপর তিনি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্তের সংকল্প নিলে তাকে এবং তার স্ত্রীকে মন্দিরে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহায় খ্রিস্টীয় ১৫৬৭-৬৮ সনে রাজীবলোচন ওরফে কালাচাঁদ রায় জগন্নাথ মন্দির আক্রমণ করে। কথিত, প্রভু বলভদ্র, জগন্নাথ ও দেবী সুভদ্রার দারণনির্মিত মূর্তি তিনি পুড়িয়ে দেন। বালেশ্বরের গোপীনাথমন্দির, ভুবনেশ্বরের কাছে কোণার্ক, মেদিনীপুর, ময়ূরভঞ্জ, কটক, পুরীর অসংখ্য মন্দিরের ধ্বংসলীলা কাঁলাচাঁদকে কালাপাহাড় নামে কুখ্যাত করে। খ্রিস্টীয় ১৫৭২ সনে কালাপাহাড় আক্রমণ করে কামরূপ কামাখ্যা দেবীর মন্দির। কালাপাহাড়ের মন্দির আক্রমণের প্রক্রিয়া একটু অভিনব ছিল। গোরুর চামড়ার বিশাল আকৃতির ঢোল এবং পেতলের বিশাল আকৃতির ঘণ্টা বাজিয়ে মন্দিরের ভিতরে অনুরণনের সৃষ্টি করায় মৃত্তিকা নির্মিত দেবমূর্তিগুলো ভঙ্গুর হয়ে যেত, হাত পা খসে যেত। এসব দেখে উপস্থিত লোকজন হতভম্ব হয়ে পড়লে প্রতিমাকে উপড়ে ফেলা হতো। গোমাংস নিষ্ক্ষেপ করে মন্দিরের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা নষ্ট করে দেওয়া হতো।

কিন্তু, আমরা তো অবস্থান করছিলাম মাতৃসাধক জগদানন্দকে নিয়ে। দীপাঘিতার নিশীথে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত শবসাধনায় বসেছেন তিনি। তন্ত্রসাধনার সবচেয়ে কঠিন পথ শবসাধনা। উত্তরসাধক গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং। বড়ো কঠিন এই সাধনা। গুরুর আদেশে জগদানন্দ শবসাধনায় বসেন, উত্তরসাধক হন গুরুদেব নিজেই। গুরুদেবের কাছে জগদানন্দ শুনেছেন তন্ত্রসাধনা হলো

আসলে শক্তির অনুসন্ধান। তন্ত্রে শক্তির দুটি রূপ— শিব ও শক্তি। শিব হলেন শব অবস্থায় নিশ্চল প্রাণহীন পদার্থ। কালী হলেন শক্তি। তিনি যখন শিবের সঙ্গে যুক্ত হন শিব তখন চেতনা প্রাপ্ত হন। তিনি তখন গতিশীল হন, কর্মক্ষমতা প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানে যেমন বলা হয়ে থাকে শক্তি কোনো পদার্থকে আশ্রয় না করে নিজ সত্তা প্রকাশ করতে পারে না, তেমনই পদার্থ ও শক্তি ছাড়া সত্তা প্রয়োগ করতে পারে না। শিব এবং শক্তিও তাই, অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত। সাধক জগদানন্দ একসময় সেই অচেতন সত্তায় চেতন অনুভব করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন শিবশক্তি জাগ্রত হয়েছে। তন্ত্রোক্ত শবসাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। সিদ্ধিলাভের পর গুরু ব্রহ্মানন্দ তাঁকে পূর্ণানন্দ নামে অভিষিক্ত করেন। ব্রহ্মানন্দ গিরি সম্প্রদায়ের সাধক ছিলেন। পূর্ণানন্দ তাই হলেন পূর্ণানন্দ গিরি। সিদ্ধিলাভকালে জগদানন্দ ইষ্টদেবীকে বললেন, মা আজ দীপাঙ্ঘিতা কালীপূজা। জগৎসংসার তোমার পূজায় ব্যস্ত। আমি হতভাগ্য, তোমার বাহ্যিক পূজার ক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারলাম না। উত্তর পেলেন—‘তোর বাহ্যিক পূজার আয়োজনের প্রয়োজন নাই। তোর বংশেও যেন কেউ ইহা না করে’। এরপর দেবী একবার তাঁকে বাম কোলে নিলেন—‘এই গণপতি তোকে বসাইলাম’। আবার ডান কোলে নিয়ে বললেন—‘এই কার্তিকেয় তোকে ডান কোলে বসাইলাম’। জগদানন্দ এর অর্থ কিছুই বুঝলেন না। দেবী বললেন—‘এখন থেকে তুই ও তোর বংশধরেরা আমার বামে গণেশ ও দক্ষিণে কার্তিকেয়কে স্থান দিয়ে একতত্ত্বে আমার পূজা করবি’। একতত্ত্বরূপ হলো মহাদেবীর সঙ্গেই মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর পূজা। মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর আলাদা মূর্তির প্রয়োজন নেই।

এরপর গুরু সিদ্ধিলাভের বাসনায় বসেন শবসাধনায়, উত্তরসাধক শিষ্য পূর্ণানন্দ। এদিকে পূর্ণানন্দের ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতি ও সাধন প্রক্রিয়ায় কিছু বিচ্যুতি ঘটায় শব সাধককে নিয়ে ঊর্ধ্বগামী হয়। জগদানন্দ তখনো জানতেন না গুরুর অভিষেকের বৃত্তান্ত। জানতেন না শাপগ্রস্ত সাধক ব্রহ্মানন্দ শাপ মুক্তির জন্য পাগলের মতো খুঁজে বেড়িয়েছেন উপযুক্ত শিষ্যের।

ব্রহ্মানন্দের গুরু ছিলেন তান্ত্রিকচার্য সিদ্ধ মহাসাধক ত্রিপুরানন্দ। ব্রহ্মানন্দের গার্হস্থ্য নাম ছিল ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তবাগীশ। তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। গৌড়ের সম্রাট শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের কাছে ভাগীরথী নদীর তীরে জৈন বণিকদের আদি বাসস্থান, বালুচরি রেশম শাড়ির জন্য বিখ্যাত বালুচর (আজ জিয়াগঞ্জ) ছিল তাঁর আদি নিবাস। শিশুকাল থেকেই তীক্ষ্ণ মেধাবী, সংস্কৃতজ্ঞ ও তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ। ‘তারা’ বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি ত্রিপুরানন্দ নামে এক তন্ত্র সাধকের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। একদিন তন্ত্রশাস্ত্রে ত্রিপুরানন্দের ন্যূনতা বিবেচনা করে গুরুভ্রাতাদের কাছে নিজের মত প্রকাশ করেন। ঘটনাক্রমে এই উক্তি ত্রিপুরানন্দের গোচরে এলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন।

তিনি শাস্ত্রাভিমাত্রী শিষ্য ব্রহ্মানন্দকে অভিসম্পাত করেন, ‘তোর সিদ্ধিলাভ হবে না।’ ক্রুদ্ধ গুরুর অভিসম্পাত অখণ্ডনীয় জেনে ব্রহ্মানন্দ গুরুর চরণ ধরে অনুগ্রহ ভিক্ষা চান। গুরুভ্রাতারাও ক্রোধ সংবরণ করে ব্রহ্মানন্দের প্রতি প্রসন্ন হওয়ার জন্য বারংবার গুরুর কাছে অনুরোধ জানাতে থাকেন। সকলের কাতর অনুরোধ উপেক্ষা না করতে পেরে ত্রিপুরানন্দ বলেন, “উপযুক্ত শিষ্যের মাধ্যমে কামাখ্যা মহাতীর্থের সংস্কার এবং মহাদেবীকে তুষ্ট করতে পারলেই শাপমুক্ত হতে পারা যাবে।” শাপমুক্তির অভিলাষে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানন্দ অন্বেষণ শুরু করলেন উপযুক্ত শিষ্যের। নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করে দেবতার কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন তাঁর অসংখ্য লক্ষ্যের। এদিকে নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করতে করতে ব্রহ্মানন্দ একদিন উপস্থিত হলেন মৈয়মনসিংহের কাটিহালী গ্রামে, গুরুভ্রাতা পুরন্দরের সন্ধানে। মহামায়ার কী অদ্ভুত লীলা! গ্রামে দ্বাদশবর্ষীয় এক বালক সাধকলক্ষণযুক্ত হওয়ায় কৌতূহলী হয়ে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন জগদানন্দ নামে ওই বালক তাঁর বাল্যবন্ধু পুরন্দরের পুত্র। পুত্রের জন্মের কিছুদিন পরেই পুরন্দরের মৃত্যু হয়। পুরন্দরের কাহিনি একটু সবিস্তারে বলা দরকার। এঁরা ছিলেন রাঢ়ী শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। এঁদের ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ ছিলেন বেদবিদ সর্বতন্ত্রবিশারদ শ্রীশ্রী অনন্তচার্য। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান অত্যাচারে ভাগীরথী তীরে বড়নগর এলাকায় (অতীতের ব্রহ্মপুত্র আজকের মুর্শিদাবাদ অঞ্চল) হিন্দু পরিবারগুলির বসবাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিশেষ করে অল্পবয়সী ও যুবতী কন্যা রাখা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কথিত, অনন্তচার্যের অযোধ্যানাথ নামে এক শিষ্য নবাবের অত্যাচারে বড়নগর এলাকা পরিত্যাগ করে মৈয়মনসিংহ জেলার খাণ্ডুরিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। স্থায়ী প্রতিভাবলে তিনি সেই এলাকায় অচিরেই গণ্যমান্য হয়ে ওঠেন। নতুন এলাকায় তিনি হংসদাস নামে পরিচিত হন। কোথাও কোথাও এই ব্যক্তির নাম হংসাদিত্য নামেও উল্লেখ আছে। প্রতিবছর তিনি খাণ্ডুরিয়া গ্রাম থেকে গুপ্তভাবে বড়নগরে শ্রীগুরুর চরণ দর্শন করতে আসতেন। অনন্তচার্যের রূপবতী ভগিনী যাতে কোনোভাবেই মুসলমান শাসকের কোপদৃষ্টিতে না পড়ে সে নিয়ে চরম দুঃশিস্তায় ছিলেন তিনি। অযোধ্যানাথ গুরুদেবের ভগিনীকে মৈয়মনসিংহ জেলার খাণ্ডুরিয়া গ্রামে নিয়ে আসেন এবং নিজের পুরোহিত পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন। খাণ্ডুরিয়া গ্রামের পাশেই ‘কার্ণাটীপ’। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ সম্প্রদায়ের হিন্দুদের গ্রাম। ক্রমে জনবসতি বৃদ্ধি পেয়ে খুব বড়ো ও বর্ধিষ্ণু গ্রামে পরিণত হয়। এই গ্রামই কাটিহালী নামে পরিচিত হয়। অনন্তচার্য মুসলমান অত্যাচারে ভাগীরথী তীর ছেড়ে শিষ্য হংসাদিত্যের আশ্রয়ে কাটিহালী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। অনন্তচার্যের ছয় পুত্রের জ্যেষ্ঠ আচার্য পুরন্দর। নবদ্বীপ থেকে শিক্ষালাভ করে গ্রামে তিনি চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। কিছুদিন পর চতুষ্পাঠীর দায়িত্ব তৃতীয় ভ্রাতা লোকনাথ গুণার্ণবের

হাতে ন্যস্ত করে নিজে ঈশ্বরসাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন। এরমধ্যে জগদানন্দের জন্ম হয়। কিন্তু অকস্মাৎ আচার্য্য পুরন্দরের মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর অভীষ্ট সাধনলোকে গমন করলে আচার্য্যপত্নী ইচ্ছাময়ী (মতান্তরে অপর্ণা) সংসারের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। পুত্র জগদানন্দের প্রতি তাঁর তেমন খেয়াল থাকত না। প্রচণ্ড দুরন্ত বালক জগদানন্দ নিজের মতন দুরন্তপনায় শৈশব অতিবাহিত করছিলেন। সেই সময়েই গ্রামে একেবারে নাটকীয়ভাবে ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ।

জগদানন্দের জন্মের পর থেকেই নানা অলৌকিক ঘটনার কথা গ্রামের সকলেরই জানা ছিল। যতদূর জানা যায় ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে (১৪২৩ শকাব্দ) পুণ্য ভীমাষ্টমী তিথির মধ্যরাতে জগদানন্দ আবির্ভূত হন। জন্মের পর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। সূতিকাগৃহে সকলে খেয়াল করলেন জন্মের পর জাতকের ক্রন্দন শোনা যায়নি। বরং সদ্যোজাত শিশুর কচি কচি দুটি হাত বদ্ধাঞ্জলিপূর্বক এবং চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় স্থির হয়ে আছে। জাতকের উজ্জ্বল গৌর মুখমণ্ডল এবং এক অপূর্ব জ্যোতি শিশুর চারপাশ বেস্তন করে আছে এবং তা ছড়িয়ে পড়ছে সূতিকাগৃহের চতুর্দিকে। এমন অপূর্ব ঘটনার সাক্ষী আর কখনো না হওয়ায় ধাত্রী এবং প্রসূতি ভয়ে ও বিস্ময়ে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সম্মিত ফিরলে দেখেন সেই জ্যোতি অন্তর্হিত হয়েছে এবং জাতক হাত পা ছুঁড়ে ক্রন্দন করছে। জগদানন্দের বয়স যখন দুই বছর। এক গ্রীষ্মের দিনে মাতা অপর্ণা দেবী সুপ্ত বালককে ঘরের বারান্দায় শুইয়ে রেখে গৃহকর্মে ঘরের অভ্যন্তরে। বাইরে সূর্যের প্রখর আলোক শিশুর মুখের ওপর। এই সময় একটি সাপ ধীরে ধীরে ফণা বিস্তার করে বালকের মুখের কাছে উঠে এলে একটি অপরিচিত কালো মেয়ে ‘সাপ সাপ’ বলে চিৎকার করে ওঠায় মাতা অপর্ণা দেবী ও বাটার অন্যান্যেরা গৃহের ভিতর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলে চিৎকার চোঁচামেচির আওয়াজে সাপটি দ্রুত পলায়ন করে এবং ওই কৃষ্ণবর্ণের মেয়েটিরও কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। বংশ পরম্পরায় আগত শ্রুত কাহিনি এবং স্বগ্রামস্থ ও চতুর্পাশ্ববর্তী গ্রামের প্রাচীন প্রাচীনাদের নিকট প্রাপ্ত ঘটনায় জানা যায় যে জগদানন্দের পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতি কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে নিদ্রিত অবস্থায় বালকের শয্যা নানা বর্ণের অপূর্ব সুগন্ধী পুষ্পে ভরে থাকত। কিন্তু সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই ওই সব পুষ্প অন্তর্হিত হয়ে যেত।

পিতৃব্য লোকনাথ গুণার্ণবের চতুঃপাশীতে জগদানন্দের লেখাপড়ায় কোনো উৎসাহই ছিল না। এইসব বৈদিক অধ্যয়ন, সংস্কৃত, ব্যাকরণের প্রতি বালকের কোনো আগ্রহ ছিল না। যে শাস্ত্রে ঈশ্বর দর্শন হয় না, তা অধ্যয়ন করে কোনো লাভ নেই—এই মতে বিশ্বাসী বালক জগদানন্দ গ্রামে ঝোঁপ জঙ্গলে দস্যুপনা সহকারে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। এই সময়েই বালকের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎ। ব্রহ্মানন্দের জহুরি চোখ প্রথম দর্শনেই বুঝে ফেলেছিল যে এতদিন ধরে তিনি যাঁর অনুসন্ধান ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন, জগদানন্দ

তাঁরই সন্ধান দিয়েছেন। পরমাত্মার সন্ধান পাওয়ায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে ব্রহ্মানন্দ জগদানন্দের গৃহের খোঁজ করলেন। পরিচয়ে জানা গেল, বালক তাঁর গুরুভ্রাতা পুরন্দরের একমাত্র পুত্র। তিনি বন্ধুপত্নী অপর্ণা দেবীর কাছে পুত্র ভিক্ষা চাইলেন। একমাত্র পুত্র জগদানন্দের বিদ্যাচর্চায় আকর্ষণ না থাকায় অপর্ণা দেবীও মনকণ্টে ছিলেন। অকস্মাৎ পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধান মেলায় তিনিও যেন তৃপ্ত হলেন। ব্রহ্মানন্দ জগদানন্দের মাতাকে পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার কথা বলায় বালক জগদানন্দ আপত্তি তুলে বলেন— এই শাস্ত্র শিক্ষা করে কী হবে? এতো শুধু পাণ্ডিত্য প্রকাশের উপায়। আমি চাই সেই শিক্ষা যার মাধ্যমে আমার সামনের সৃষ্ট পদার্থের রহস্য উন্মোচিত হবে। স্রষ্টার সাক্ষাৎকার পাব। ব্রহ্মানন্দ বালক জগদানন্দকে বোঝালেন, স্রষ্টার সাক্ষাৎকার লাভের জন্যই শাস্ত্র শিক্ষা ও জ্ঞানের দরকার। জ্ঞান ব্যতীত স্রষ্টার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না।

জগদানন্দ সম্মত হলে তিনি তাঁকে নিয়ে মৈয়মনসিংহ অঞ্চল ছেড়ে আবার গোড় অভিমুখে যাত্রা করলেন। বালুচরের (জিয়াগঞ্জের) কৃতী অধ্যাপক ও সতীর্থ হরিহর ভট্টাচার্যের কাছে জগদানন্দকে নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন। অধ্যাপক হরিহর ভট্টাচার্য কন্যা সর্বাণীকে নিয়ে বালুচরে বসবাস করতেন। হরিহর দীর্ঘদিন পর গুরুভ্রাতা ভবানীপ্রসাদকে দেখে অবাক হয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করায় বুঝতে পারলেন তাঁকে জগদানন্দের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। হরিহরের কাছে জগদানন্দের দায়িত্ব অর্পণ করে ব্রহ্মানন্দ পুনর্বীর তীর্থ পরিক্রমায় যান। অধ্যাপকগৃহে জগদানন্দ বিভিন্ন শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করলেন। অচিরেই তন্ত্র, বেদান্ত, দর্শন, যোগ অনুশীলন ইত্যাদিতে তিনি পারদর্শী হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত। ব্রহ্মানন্দ বালুচরে পুনর্বীর এসে অধ্যাপক হরিহর ভট্টাচার্যের বাড়িতে এসে ছাত্রের শিক্ষার অগ্রগতি জিজ্ঞাসা করলেন। হরিহর উত্তর দিলেন তাঁর দীর্ঘ তিনদশকের শিক্ষকতায় এমন শ্রুতিধর ছাত্রের তিনি সন্ধান পাননি। এজন্য তিনি নিজের জীবনকে ও বন্ধুকে ধন্যবাদ জানালেন। এরপর নিজের একমাত্র কন্যা সর্বাণীর সঙ্গে জগদানন্দের বিবাহ দেওয়ার জন্য ভবানীপ্রসাদের কাছে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাতে থাকেন। তাঁর ইচ্ছা এই ছাত্রের সঙ্গে মাতৃহারা একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়ে সংসার জীবন থেকে তিনি মুক্তি নেবেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর হরিহরের স্ত্রী শোকাতুর হয়ে পরলোকগমন করেন। এরপর মাতৃহারা কন্যাকে নিয়ে অত্যন্ত বিষাদবস্থায় তিনি অধ্যাপনা পরিত্যাগের সংকল্প করেছিলেন। সেই সময়েই জগদানন্দের আগমন। কন্যা সর্বাণীকে জগদানন্দের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি উভয়কেই সাহিত্য, কাব্য, ব্যাকরণ ও নানা শাস্ত্রে পারদর্শী করে তুলেছেন। ব্রহ্মানন্দ অনুমান করলেন জগদানন্দকে সংসারী করা প্রয়োজন। সর্বাণীর কথা তিনি জগদানন্দের মাতা ইচ্ছাময়ীর কাছে জানালে ইচ্ছাময়ী তাতে সম্মতি দেন। এদিকে জগদানন্দ তখন চান তন্ত্রশাস্ত্রে

With Best Compliments From -

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

Sales & Service

225-D, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone : 2302-5250/ 3/ 4, Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329,

E-mail : scdtodi@scdtodi.com

Authorised Dealers of

● BOSCH LTD. ● BOSCH, GMBH-GERMANY,

● DEUTZ, A. G., GERMANY

● LOMBARDINI - ITALY, ● V. M. MOTORI - ITALY

With Best Compliments From :

Dr. Sawar Dhanania

*Master in Mech. Engineering (Gold Medalist) Jadavpur
University, Kolkata*

PhD IIT, Kharagpur, W. B.

Chairman

*Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry
Govt. of India*

Email : sdhanania@gmail.com

Mob. : 9331741971

সিদ্ধি। তাই গুরুকন্যা বা অন্য কারও সঙ্গে পাণিগ্রহণে নিজের অপারগতা প্রকাশ করলে ব্রহ্মানন্দ তাঁকে বোঝালেন যে সর্বাণী গুরুকন্যা নয়, অধ্যাপক কন্যা এবং তাঁর মায়েরও সেইরূপ ইচ্ছা। তিনি বলেন ‘তন্ত্রসাধনা শক্তি ব্যতীত বিড়ম্বনামাত্র। বাল্য কৈশোরের পর প্রথম শ্রেষ্ঠ আশ্রম গার্হস্থ্যশ্রম অবলম্বন না করলে এই শিক্ষা সম্ভব নয়। এরপর তোমায় আমি তন্ত্রমতে অভিষিক্ত করব। মায়ের ইচ্ছা ও আদেশের কথা ও ব্রহ্মানন্দের কাছে তত্ত্বোক্ত শিক্ষা পাওয়ার আনন্দে অধীর হয়ে ওঠায় জগদানন্দ বিবাহে সম্মতি দেন। ব্রহ্মানন্দ পুনর্বীর তীর্থে গমন করলেন।

বিবাহ সম্পন্ন হলে জগদানন্দ স্ত্রী সর্বাণীকে নিয়ে কাটিহালী গ্রামে বসবাস শুরু করলেন। জগদানন্দ এখন ঘোরতর সংসারী। পৈতৃক সামান্য সম্পত্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি মাতা ও স্ত্রী-সহ সুখে বসবাস এবং শাস্ত্র আলোচনা ও পুরাণাদি গ্রন্থ নকল করার কাজ শুরু করলেন। ইতিমধ্যে তাঁর দুই পুত্রের জন্ম হয়। আটশ বছর বয়সে আনুমানিক ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে (১৪৪৮ শকাব্দ) তিনি বিষ্ণুপুরাণ নকল করেন। এর দুবছর পর আনুমানিক ১৪৫০ শকাব্দে ব্রহ্মানন্দ কাটিহালী গ্রামে এসে জগদানন্দকে দীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা অভিপ্রায় প্রকাশ করলে ইচ্ছাময়ী সর্বাণীকরণে তাতে সম্মতি দেন। দীক্ষালাভের পর জগদানন্দ প্রথমে কিছুদিন বাড়িতে এবং তারপরে নিকটবর্তী ঘটাবতী নদীর তীরে তারাবনে ইষ্টদেবীর সাধনায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। ব্রহ্মানন্দ তাঁকে তন্ত্র শাস্ত্রের পাঠ দান করেন। এরপর তিনি বীরাচারমতে ইষ্টদেবীর সাধনা শুরু করেন। সময়ে সময়ে তিনি গুরুগৃহে থেকেও শিক্ষালাভ করতেন।

তন্ত্রশিক্ষা লাভের পাশাপাশি জগদানন্দ গুরুর সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সম্যক জ্ঞানলাভ করেন। ১৪৬০ শকাব্দে জগদানন্দের নিজ গ্রামের পূর্বদিকে গাজরা নদীর তীরে দীপাঙ্ঘিতা নিশীথে শবসাধনার আয়োজন হয়। ব্রহ্মানন্দ তখনও গুরুর অভিষাপের কথা জগদানন্দকে জানায়নি। স্থির হয়েছিল শবসাধনায় ব্রহ্মানন্দ প্রথমে উত্তরসাধক হবেন এবং পরে জগদানন্দ উত্তরসাধক হবেন। গুরুদেব সাধনাকার্য সম্পূর্ণ না করেই শব সমেত অন্তর্হিত হওয়ায় কিশোর পূর্ণানন্দ কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়লেন। তিনি অমাবস্যার ঘন অন্ধকারে গুরুদেবের সন্ধান শুরু করেন। ইতিমধ্যেই রাত্রি শেষ হয়ে যায়, কিন্তু গুরুদেবের কোনো সন্ধান না পেয়ে বড়ই বিষম হয়ে পড়েন। জগদানন্দ যোগ সাধনায় সিদ্ধ হলেও গুরুস্থান লঙ্ঘন করতে পারেননি। এরপর ইষ্টদেবীর কাছে সবিস্তারে সব বর্ণনা করে মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি গুরুসন্ধান বের হলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? কোনো অনুমান নাই!

কাহিনি এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। দুর্গম পথ ধরে পূর্ণানন্দ চলেছেন গুরুর সন্ধান, কিন্তু কোথায় যাবেন তা তিনি জানেন না। পথিমধ্যে তিনি দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হলে উপলব্ধি করলেন এক অদৃশ্য মায়াবীশক্তি তাঁকে রক্ষা করেছেন। রাতে স্বপ্নাবিষ্ট

হলেন, দেবী আদেশ দিয়েছেন কামাখ্যা মন্দিরের সংস্কারের কাজে নিয়োজিত হতে এবং গুরু সহযোগে কামাখ্যাতন্ত্রে সিদ্ধ হতে। কিন্তু গুরুদেব কোথায়? এমনিভাবেই উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে একদিন অসম অঞ্চলের মণিপুরে উপস্থিত হলেন। গুরুদেব মণিপুরে থাকতে পারেন দেবীর কাছে এমন ইঙ্গিত পেতে পারেন পূর্ণানন্দ। তিনি মণিপুরে শ্রীগুরুর সন্ধান শুরু করলেন। স্থানীয়দের কাছে কোনো বিদেশি এখানে অবস্থান করছেন কিনা তা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করলে সংবাদ পেলে এক ব্যক্তি চণ্ডাল কন্যাকে বিবাহ করে চাষাবাদ করে সুখে দিনযাপন করছেন। পূর্ণানন্দ গোপনে সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান চালাতেই বুঝলেন ইনিই তাঁর গুরু ব্রহ্মানন্দ। স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে চণ্ডালগৃহে অবস্থান করছেন। একদিন চণ্ডালগৃহের বারান্দায় গুরুদেবের দিবানিদ্রার সময়ে পূর্ণানন্দ একটি বটপাতায় একজটা দেবীর বীজমন্ত্র লিখে ব্রহ্মানন্দের সামনে রেখে অদূরে আত্মগোপন করে রইলেন। এদিকে, নিদ্রাভঙ্গ হলে ব্রহ্মানন্দ বটপাতা দেখে একটু আশ্চর্য্যব্বিত হয়ে বটপাতাটি তুলে নিজের বীজমন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে রইলেন। অচিরেই তাঁর সমস্ত স্মৃতি ফিরে এলে ‘পূর্ণানন্দ! পূর্ণানন্দ!’ বলে চিৎকার করতে করতে বাইরে বের হয়ে এলেন। অদূরেই পূর্ণানন্দকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বৃকে জড়িয়ে ধরে অভিশপ্ত জীবনের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। শ্রীগুরুর অভিষাপের ফলেই তাঁর শবসাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়নি এবং উপযুক্ত শিষ্যের মাধ্যমে কামাখ্যা তীর্থ সংস্কার এবং কামাখ্যা দেবীকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই অভিষাপ খণ্ডন হবে।

গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয়, পূর্ণানন্দও স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিলেন কামাখ্যা সংস্কারের। অচিরেই মহানন্দে ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ কামাখ্যাপ্রাণে পৌঁছে পীঠ সংস্কারের কাজে সাধনাকার্য শুরু করেন। জনশ্রুতি, একদিন ব্রহ্মপুত্র নদে কামাখ্যা অঞ্চলের দস্যু নীলাম্বরের একমাত্র পুত্র জলের তীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। পূর্ণানন্দ তখন নদীতে স্নান করতে এসেছিলেন। তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করে স্রোতের জলে ভেসে যাওয়া বালককে নদী থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। নদীতীরের সকলেই তা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন।

কামাখ্যা অবস্থান কালেই পূর্ণানন্দ ১৪৬৬ শকাব্দে আশ্বিন মাসে ‘শক্তিক্রম’ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তখন তাঁর বয়স ৪৩ বছর। নিত্যমুক্তস্বভাব বিশিষ্ট সাধকের জন্যই এই শাস্ত্রগ্রন্থ। এরপর ‘তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিনী’, ‘শান্তানন্দ তরঙ্গিনী’, ‘যোগসার’, ‘কালীককার কূট সহস্রনাম’ প্রভৃতি তন্ত্র নিবন্ধ রচনা করেন। তিনি তাঁর প্রতিটি গ্রন্থেই গুরুদেব ব্রহ্মানন্দের পাদবন্দনা করেছেন। গিরি, যতি, পরিব্রাজক, পরমহংস এই উপাধিগুলি গ্রন্থগুলিতে তাঁর নামের শেষে পাওয়া যায়। ‘শক্তিক্রম’ রচনার তেত্রিশ বছর পর জীবনের ৭৬ বছরে ১৪৯৯ শকাব্দে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি’ রচনা করেন। এরই ষষ্ঠ প্রকাশ ‘ষট্চক্রনিরূপণ’— যা ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্যার জন উড্রফ ‘The Serpent Power’ নামে ইংরেজি

ভাষায় এর অনুবাদ করে সমগ্র বিশ্বকে ভারতবর্ষের শক্তি সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়েছেন। সম্ভবত ‘শ্যামারহস্য’ তাঁর রচিত গ্রন্থ।

কামাখ্যা অবস্থানকালে এবং এইসব গ্রন্থ রচনার মাঝেই তিনি নানা তীর্থে এবং বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায়ের ও তাঁদের গুরুদের নিকট তন্ত্র সম্পর্কে আচার পদ্ধতি ও মতামত জানার চেষ্টা করতেন। নিজ গ্রন্থে তিনি তা উল্লেখও করেছেন।

তাঁর কাশ্মীর যাত্রা প্রসঙ্গে জানা যায় যে কাশ্মীর রাজ্যে একবার শাক্ত ও শৈবদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ দেখা দেয়। রাজ্যে প্রবল অশান্তি সৃষ্টি হয়। কাশ্মীররাজ পূর্ণানন্দকে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসাকল্পে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ জানালে পূর্ণানন্দ গুরু ব্রহ্মানন্দের ইচ্ছায় এবং বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে কাশ্মীরে পদার্পণ করেন। সেখানে রাজ আত্মত্ব ধর্মসভায় পর পর বেশ কয়েকদিন ধরে তন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বরাশির ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত শাক্ত, শৈব উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিত, সাধক ও জনসাধারণ সকলেই পরম সম্মত হলেন। বিবদমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবোঝির অবসান হলো এবং পারস্পরিক প্রীতি প্রণয় সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হলো। কাশ্মীরবাসী ও রাজার আগ্রহে পূর্ণানন্দ কিছুদিন কাশ্মীর রাজ্যে বসবাস করেন। সেই সময় কাশ্মীর রাজমহিষী কর্ণরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর শ্রবণশক্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রাজা গভীর মনঃকষ্টে একদিন তা পূর্ণানন্দের কাছে বিনীতভাবে নিবেদন করেন। সেই রাত্রি পোহালেই মহিষী রাজাকে প্রশ্ন করলেন, ‘মহারাজ! বাইরে পাখিরা ডাকিতেছে কি? রাজা প্রত্যুত্তর দিলেন, হ্যাঁ! তুমি আমার কথা শুনিতে পাইতেছ কি?’ এইভাবে সাধক পূর্ণানন্দের অনুগ্রহে রাজমহিষী শ্রবণশক্তি পুনর্বার ফিরে পান।

দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ রংদ্রাক্ষবক্ষশোভিত সদানন্দময় সর্বদা যোগযুক্ত জগতের আনন্দদানকারী পূর্ণানন্দ সমস্ত সাধক সমাজকে বর ও অভয় প্রদান করেছেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভের অন্তরায় বিষয়গুলি পুনঃ পুনঃ সাধককে অবহিত করিয়েছেন। পশুভাবে সাধনা আরম্ভ করে বীরভাবে অতিক্রম করে কীভাবে দিব্যভাবের সাধনায় মগ্ন থাকতে হয় উত্তরসাধককে তাই শিখিয়ে গেছেন পূর্ণানন্দ। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর পূর্ণানন্দ মাতা ইচ্ছাময়ীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে অন্তিম সময়ে তিনি মাতৃদেবীকে ইষ্টদেবীর সাক্ষাৎ করাবেন।

কামাখ্যাদ্বীপ ত্যাগ করার পর পূর্ণানন্দ বেশ কিছুদিন কাটিহালী গ্রামে বসবাস করলেও মাঝেমাঝেই ভাগীরথী তীরে গুরুগৃহে চলে আসতেন। সেখানেই তিনি ‘শ্যামা রহস্য’ রচনা করেছেন। শোনা যায় গুরুগৃহে অবস্থানকালে সংবাদ আসে যে তাঁর মাতৃদেবী শ্যামাশায়ী। গুরুগৃহে যাওয়ার আগে তিনি অসুস্থ মাতৃদেবীকে কথা দিয়েছিলেন তাঁর শেষ অবস্থায় তিনি গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাবেন। মাতৃদেবীর অসুস্থতার সংবাদে তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কালবিলম্ব না করে পূর্ণানন্দ যোগবলে আকাশপথে এক রাত্রিতে স্বগ্রাম

কাটিহালীতে মৃত্যুশয্যা জননীর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো ইষ্টমূর্তি দর্শন করিয়েছিলেন। মাতা ইচ্ছাময়ী পরমেশ্বরীর কোলে চিরতরে স্থান লাভ করেন।

এদিকে পূর্ণানন্দের মাতৃবিয়োগের সংবাদ পেয়ে ব্রহ্মানন্দও সেখানে উপস্থিত হন। শ্রাদ্ধকার্যের দিন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হতে না দেখে প্রশ্ন করলে জানা যায় যে পূর্ণানন্দকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কারণ তিনি নিজ গুরুকন্যাকে বিবাহ করে ঘোরতর অন্যায় কাজ করেছেন। আবার বীরাচারে মদ্য মাংস প্রভৃতি পঞ্চম-কারের সাধনা করে মহাপাপে লিপ্ত হয়ে পশুসুলভ আচরণ করেছেন। মদ্যপান অতি গর্হিত অপরাধ, স্মৃতিশাস্ত্রে তা উল্লিখিত আছে।

ব্রহ্মানন্দ, মাধবাচার্য ও পূর্ণানন্দের খুল্লতাত অধ্যাপক লোকনাথ গুণার্ণব সকলেই গ্রামের পণ্ডিতদের কথা শুনলেন। বৈষ্ণব মাধবাচার্য পূর্ণানন্দের পিসতুতো ভাই। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ। তিনি পূর্ণানন্দের হয়ে কিছু বলতে গেলে তাঁকেও কুলাচারী, পাপী পাপিষ্ঠ প্রভৃতি বলে তিরস্কার করা হলো। অধ্যাপক গুণার্ণব সে সময় শতবর্ষ উত্তীর্ণ। গ্রামে সর্বজনশ্রদ্ধেয়, সকলেই তাঁকে মান্যতা দেন। পূর্ণানন্দ তাঁর লিখিত গ্রন্থ প্রবন্ধাদি খুল্লতাতকে গোপনে দেখাতেন। সর্বশেষে ‘শ্যামারহস্য’-এর পাণ্ডুলিপি তাঁকে দেখিয়েছেন। গুণার্ণব মহাশয় গ্রামবাসীদের সমস্ত বক্তব্য শুনে বললেন, আপনারা যে প্রেতাচার্য মুক্তির জন্য ক্রিয়া করার জন্য এখানে এসেছেন তিনি পূর্বেই মুক্ত। মহামায়া অন্তিম সময়ে তাঁকে দর্শন দিয়ে নিজের চরণে স্থান দিয়েছেন। পূর্ণানন্দের তপস্যাপ্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছে। সে ব্রহ্মজ্ঞানী, নিজের বংশে পূর্বপুরুষ এবং অধঃস্তন পুরুষদের উদ্ধার কাজেই সে ক্রিয়াকর্ম করেছে। সে সিদ্ধসাধক। এই বাংলাদেশে তন্ত্রসাধনার নিবন্ধ রচনা প্রভৃতিতে পথিকৃৎ। আচার্য ব্রহ্মানন্দ রচিত ‘তারা রহস্য’ এবং পূর্ণানন্দ বিরচিত ‘শক্তিক্রম, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, শ্যামারহস্য’ প্রভৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত শাস্ত্র এবং শাক্ত দর্শনের এক অক্ষয় সম্পদ। ইহাদের পূর্বে বঙ্গদেশে পঞ্চগোত্রীয় অন্য কোনো ব্রাহ্মণ এইরূপ কর্মে নিবিষ্ট হন নাই। আপনারা পণ্ডিতগণ এখানে ত্রিবেণী তীর্থে উপস্থিত হয়েছেন। তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যায় সিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর; কালী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যায় সিদ্ধ পূর্ণানন্দ, সিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য মাধবাচার্য এই স্থানে উপস্থিত। আমাদের এই গৃহ আজ পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পূর্ণানন্দ শুধুমাত্র তন্ত্রসিদ্ধ কালীসাধক নন, তিনি স্মৃতি, দর্শন, সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি নানা বিদ্যায় ঈশণীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। শ্রাদ্ধ ও শাস্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। আপনাদের কাছে অনুরোধ, এই শ্রাদ্ধকার্যে হয় অংশ নিন নতুবা বিদায় গ্রহণ করুন। গ্রামের ব্রাহ্মণেরা তখন আর কালবিলম্ব না করে শ্রাদ্ধকার্যে অংশ নিতে শুরু করেন।

মাতৃবিয়োগের পর কয়েক বৎসর পূর্ণানন্দ স্ত্রী সর্বাণী এবং

পুত্র মধুরেশ শিরোমণি ও শিষ্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে সঙ্গে নিয়ে সংসার যাপন করেন। এরপর গুরু ব্রহ্মানন্দ গ্রামে এলে তিনি সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে সাধকগণের হিতের জন্য বাকি জীবন দিব্যভাবের সাধনায় অতিবাহিত করার লক্ষ্যে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হিমালয় যাত্রার পর বঙ্গদেশের এই দুই কালীসাধকের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে অনেকের মতে হিমালয়ের ঋন্দগুহায় তাঁরা সমাধিমগ্ন আছেন। পূর্ণানন্দবংশের সাধক প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্যামারহস্যম-এর ঢীকাকার শ্যামানন্দ তীর্থনাদকে জানিয়েছিলেন যে একবার কুস্তমেলায় আগত দুই মহাসাধকের মুখে তিনি শুনেছেন যে হিমালয়ের ঋন্দগুহায় পূর্ণানন্দ এখনও অবস্থান করছেন এবং মানবকল্যাণে সমাধিমগ্ন অবস্থায় রয়েছেন।

অসম, বঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা, নেপাল প্রভৃতি স্থানে পূর্ণানন্দের অগণিত শিষ্য-শিষ্যা ছিলেন। পূর্ণানন্দ গিরির অন্তরঙ্গ শক্তিদ্র শিষ্যদের মধ্যে নবদ্বীপ নিবাসী ‘তন্ত্রসার’ প্রণেতা সাধকাগ্রগণ্য তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ অন্যতম। সমগ্র বঙ্গদেশ তথা বাঙ্গালি সমাজে বর্তমান সময়ে শক্তিপূজার এই প্রাবল্যের উৎস আচার্য পূর্ণানন্দ এবং তাঁর শিষ্য কৃষ্ণানন্দ

আগমবাগীশ। সহস্র বৎসর বৌদ্ধ আচারের প্রভাবে সনাতনীয় প্রথা এবং বৈদিক সমসাময়িক তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য প্রায় লুপ্ত হওয়ায় পথে ছিল। ভগবান শিবের অবতার পুরুষ আদি শঙ্করাচার্য এইসব শাস্ত্রকে রক্ষা করেছিলেন। তান্ত্রিকাচার্য ব্রহ্মানন্দ এবং পূর্ণানন্দ বঙ্গদেশে ইসলামি আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাওয়া মহাশক্তির এই নিগূঢ় রহস্যকে পুনরুদ্ধার করেন এবং চৈতন্য ও সমসাময়িক বৈষ্ণব সাধকদের বৈষ্ণবীয়ধারার পাশাপাশি বঙ্গদেশে শক্তিপূজার প্রাবল্যের মূল চালিকাশক্তি তাঁরাই। শক্তিসাধকদের প্রচারবিমুখতায় এঁদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র গাইকোয়ার ইউনিভার্সিটির ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন অধিকর্তা ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ১৯৩২ সালে প্রকাশিত ‘শক্তিসঙ্গম তন্ত্র’র প্রথম খণ্ড (কালী খণ্ড)-র প্রাক কথনে তিনি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এবং তাঁর গুরু পূর্ণানন্দ সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন আপাতত তাই প্রামাণ্য।

দেশভাগের পর পূর্ণানন্দের বংশধরেরা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটি অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তাদের এলাকার নাম হয় পূর্ণানন্দ পল্লী। অদ্যাবধি প্রতি বৎসর ভীমাষ্টমী তিথিতে আত্মীয় ও অগণিত ভক্তপরিবৃত হয়ে তাঁরা মহাপরিরাজক তান্ত্রিকাচার্য পূর্ণানন্দের আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপন করে আসছেন।

LUXMI TEA CO. PRIVATE LIMITED

17, R. N. Mukherjee Road, Kishore Bhawan, Kolkata-700 001

Phone No. 2248 4437/4227, Fax No. 2243 0177

E-mail : mail@luxmitema.com, Web.: www.luxmigroup.in

GROUP GARDENS

NARAYANPUR T.E.

SHYAMGURI T.E.

MONMOHINIPUR T.E.

MANOBAG T.E.

BHUYANKHAT T.E.

MANU VALLEY T.E.

GOLOKPUR T.E.

PEARACHERRA T.E.

JAGANNATHPUR T.E.

SAROJINI T.E.

FULBARI T.E.

URRUNABUND T.E.

MAKAIBARI T.E.

KENDUGURI T.E.

MORAN T.E.

SEPON T.E.

ATTABARIE T.E.

LEPTKATTA T.E.

ADDABARI T.E.

DIRAI T.E.

MAHAKALI T.E.

With Best Compliments from :

PIONEER PAPER AND STATIONERY PVT. LTD.

(Quality Ex-Book Manufacturer with latest technology & Exporter)

REGD OFFICE & WORKS:

74, BELIAGHATA MAIN ROAD
KOLKATA-700 010
PHONE: 2370-4152, FAX: 91-33-2373-2596

Email: pioneerpaperco@gmail.com

Visit Our Website: - www.pioneerpaper.co

LAUREL

FINANCIAL SOLUTIONS

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

(Stock Broker and Portfolio Manager Service)

LAURELMF FINMART PRIVATE LIMITED

(Member of Association of Mutual Funds in India)

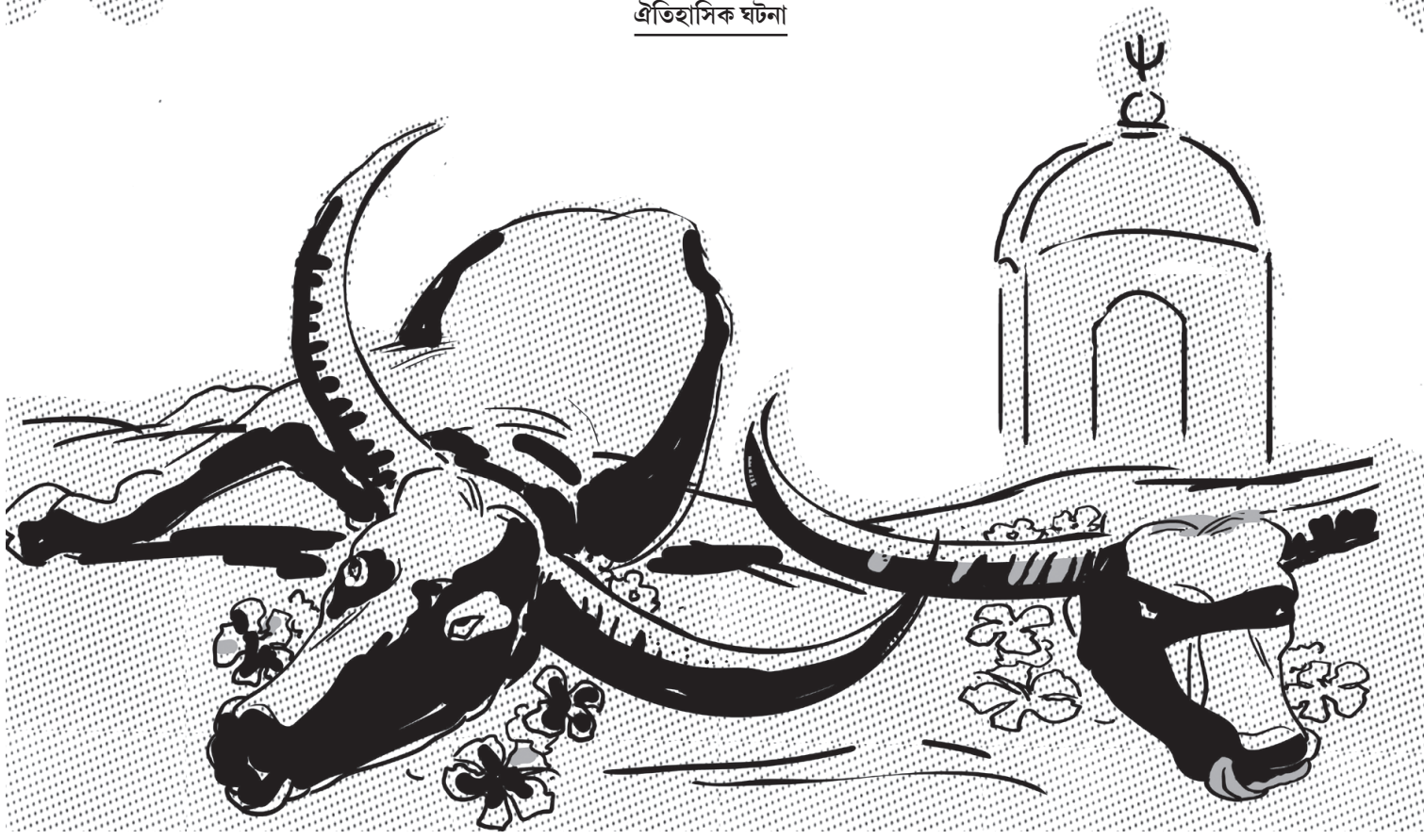
MUTUAL FUND DISTRIBUTOR

JAIN BAID & CO.

(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001

Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341 Email ID - prakash_laurel@yahoo.com



অনির্বাণ হোমশিখা রায়বাম্বিনী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

॥ এক ॥

তরঙ্গ বিভঙ্গে বয়ে চলেছে দামোদর নদ আর স্রোতস্বিনী রণ নদী।
তারই মাঝখানে সমুদ্র জনপদ রাজবলহাট। ভূভাগের অধিষ্ঠাত্রী
দেবী রাজরাজেশ্বরী রাজবল্লভী। ষোড়শ শতকের সে এক স্মরণীয় দিন।
মন্দিরে দামোদরের বন্যার মতোই জনস্রোত। মনে হয় ভুরগুট রাজ্যের সব
প্রজারই একমাত্র ঠিকানা এই রাজবল্লভীর মন্দির।

সেখানে চলছে দেবীর মহাপূজা। রাজার পূজা। তাই তান্ত্রিক পূজাতেও
রাজসিক ব্যবস্থা। ভুরগুট-রাজ রত্ননারায়ণের এক বিশেষ কামনা পূরণের
জন্য এই পূজা। অর্চকের আসনে বসেছেন রাজগুরু আগমাচার্য হরিদেব

ভট্টাচার্য। মহাসাধক—বহু শাস্ত্রবিদ। রাজার এই কাম্য পূজায় কোনোদিক থেকে যাতে কোনো বিঘ্ন না হয় তারজন্য চারিদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি।

বেলা দ্বিপ্রহর। মাথার উপরে গনগনে সূর্য। মায়ের জয়ধ্বনিতে মুখের সকলে। মন্দিরে বাজছে শঙ্খ-ঘণ্টা, কাঁসর-বাঝর, ভেরি-দামামা, ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকড়া ইত্যাদি কত না বাজনা। সঙ্গে সানাইয়ের সুর। মা-মা রবে উচ্চকিত চারিদিক। এমন সময় সব কিছু ছাপিয়ে গেল সহকারী পুরোহিতের কণ্ঠ—সময় হয়েছে বলির। প্রস্তুত করো সবকিছু।

মুহূর্তে স্তব্ধ কলরব। এগিয়ে আসে জনা বারো তাগড়াই জোয়ান। টেনে নিয়ে যায় অদূরে বাঁধা চারটি মোষ আর দু'টি মেষকে মন্দিরের লাগোয়া জলাশয়ে। সেখানেই স্নান করায় তারা ওই ছ'টি পশুকে।

স্নান করিয়ে বলির পশুগুলিকে নিয়ে আসে তারা। পুরোহিত এগিয়ে আসেন। বলির পশুদের মাথায় পরিয়ে দেন সিঁদুরের ফোঁটা। পরানো হয় রক্তজবার মালা। তারপর মন্দিরের সামনে প্রোথিত দুটি যূপকার্ঠে বন্ধ করা হয় দু'টি করে মহিষ আর একটি করে মেষকে। তীব্রস্বরে বেজে ওঠে ঢাক। আসে বলির চরমক্ষণ।

বলি দেবার জন্য সেদিন প্রথামতো আসে না কোনো কর্মকার। পরিবর্তে দুই যূপকার্ঠের সামনে খজা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দু'জন। এক পুরুষ ও এক নারী। পুরুষ আর কেউ নয়, রাজা রুদ্রনারায়ণ স্বয়ং। দীর্ঘ সুঠাম দেহ। গৌরবর্ণ, গলায় দুলছে মণিময় কনকহার। মিলে গেছে তা যেন রাজার ওই সুবর্ণগৌর তনুতে। কপালে তিলক। বয়সের সূর্য তাঁর মধ্যাহ্নরেখা পরে হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। কিন্তু কলেবরে পড়েনি তার কোনো ছায়া। এখনও তিনি মধ্যাহ্নের দীপ্ত মার্তণ্ড।

অন্যদিকে সে নারী এক সদ্য তরুণী। রাজারই এক দুর্গাধিপতির সেনাপতি কন্যা। তখনও সারা দেহে পূর্বাহ্নের সূর্যের আলো। অপরূপ, দীপ্ত নয়না। রক্তস্বরা তরুণীর কপালে সিঁদুর বিন্দু—রক্তরঙে বড়ো উজ্জ্বল। গলায় দুলছে একটি লাল জবার মালা। দেখে সকলেরই ভ্রম দেবী রুদ্রাণী বলে।

পুরোহিত এসে তাঁদের হাতে দেন আচমনের জল। পূজা করেন তাঁদের হাতের খজাদুটিকে। তারপরই বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ—এবার হোক বলি।

মা—মা—আরবে পূর্ণ চারিদিক। তাণ্ডবের সুর নানা বাদ্যে। মুহূর্তে ঝলসে ওঠে দুটি খজা—একই সঙ্গে। সামনে পড়ে তখন চারটি ছিন্নশির মহিষ আর দুটি মেষ।

নির্বিন্ম বলিতে হস্ত সকলে। স্বস্তির শ্বাস ফেলেন রাজগুরু হরিদেব। এগিয়ে আসেন তিনি। তখনও খজা হাতেই দাঁড়িয়ে আছেন রাজা। কিছুটা-বা ভাবের ঘোরে। বলির রক্তের ঝিলিক লেগেছে গায়। সেদিকে খেয়াল নেই তাঁর। তিনি তখন স্থির

অচঞ্চল।

একই অবস্থা তরুণীরও। সাময়িক বিহ্বলতা বুঝি গ্রাস করেছে তাকেও। একসময় নামিয়ে রাখে তরুণী তার খজাখানি। এগিয়ে যায় একটু। নীচু হয়ে সদ্য ছিন্ন মহিষের মাথার রক্তে রঞ্জিত করে মধ্যমা। তারপর এগিয়ে যায় রাজার দিকে।

রুদ্রনারায়ণ তখনও অচঞ্চল। চকিতে তরুণী তার কপালে ছোঁয়ায় রক্তরাঙা মধ্যমা। এঁকে দেয় তিলক। কেউ কিছু বোঝার আগেই গলার জবার মালাটি খুলে পরিয়ে দেয় রাজার গলায়। ঠোঁটের কোনায় বুঝিবা ছিল বিজলি চমকের মতোই এক চিলতে হাসি।

তারপর দেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে কাউকে কিছু বলার আগেই অশ্বারোহিণী তরুণী। অশ্বের গায়ে মৃদু আঘাত। তীব্র বেগে ছুটতে থাকে অশ্ব। হাজার হাজার চোখের সামনেই অদৃশ্য হয়ে যায় তরুণী।

ঘটনার আকস্মিকতায় মুক সকলে। উথলে ওঠা দুধে জলের ছিটায় যেমন স্তিমিত হয় তা তেমনি যেন জনতার অবস্থা। পুরো ঘটনাটাই রহস্যময় মনে হয় তাদের। রহস্যটা যে কী তা বুঝতে না-পারার কারণেই নীরব তারা।

কথা বলেন না রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য। স্মিত হাস্যে তাকিয়ে আছেন রাজার দিকে। তাকিয়ে আছেন রাজা রুদ্রনারায়ণও—সবিস্ময়ে—কামনা পূরণের মৌন-মুখর ইঙ্গিতের অভিধাতে। তাকিয়ে আছেন ঠিক সেদিনের মতোই।

॥ দুই ॥

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি রাজা রুদ্রনারায়ণের। রাজবল্লভী দেবীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন দিন কয়েক আগের ঘটনার ছায়াছবি।

যৌবনমদমত্ত দামোদরের বুক বেয়ে ছুটে চলেছে তাঁর ছিপ নৌকা তীব্রগতিতেই। দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে দামোদরের দু'পাড়ের গাছপালা—গ্রাম। রাজার কিন্তু খেয়াল নেই কোনো দিকে। উদাস এক বাউলের মতোই তাকিয়ে আছেন রুদ্রনারায়ণ।

রাজা তিনি। ভুরশুট রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। ধীবররাজা শনিভাঙ্গরকে পরাজিত ও নিহত করে ভুরশুটের সিংহাসনে বসেছিলেন গড়ভবানীপুরের চতুরানল নেওগি বা নিয়োগী। আপন বাহুবলে এবং বুদ্ধির সুস্থ প্রয়োগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভুরশুটের এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের।

চতুরানল ছিলেন অপুত্রক। একটি মাত্র কন্যা। বিয়ে দেন তিনি তাঁর ফুলিয়ার মুখোটি বংশে। বঙ্গের আদিকবি কুন্তিবাসের বংশধর সদানন্দ মুখোপাধ্যায়। যেমন দেহসৌন্দর্য তেমনই বলবীর্ষ। তিনি হলেন চতুরানলের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। নিজের হাতেই তাকে গড়ে তুলেছিলেন চতুরানল।

রাজ্যশাসনের সবরকম কুটবিদ্যাই শেখান তিনি জামাতাকে।

ভুরশুটের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে সদানন্দ নেন রায় উপাধি। নাম হয় সদানন্দ রায় মুখোটি। ভুরশুটকে গড়ে তোলেন তিনি গৌড়ের শ্রেষ্ঠ হিন্দু রাজ্য হিসেবে।

দক্ষিণ রাঢ়ের হুগলি-হাওড়া—মেদিনীপুরের বিস্তৃত অঞ্চল হয় ভুরশুট রাজ্যের অন্তর্গত। দামোদর এবং তার শাখানদী রণ, নাম যার এখন রোগের খাল—তখনকার সেই মাদারের খালের মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল অরণ্যময়। সেই বন কেটে বসত বসান সদানন্দ। গড়ে তোলেন অপ্রতিরোধ্য সেনাবাহিনী। পদাতিক বাহিনী ছাড়াও ছিল তাঁর শক্তিশালী হস্তি ও অশ্ববাহিনী। আর ছিল সুসংগঠিত এক নৌবহরও। তারই সাহায্যে তিনি হয়ে ওঠেন প্রায় অপ্রতিরোধ্য।

সদানন্দের পর তাঁর ছেলে শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ সর্বার্থেই ভুরশুটকে পরিণত করেন এক শক্তিশালী রাজ্যে। বঙ্গের সুলতান অথবা দিল্লির বাদশা—কারও প্রতি আনুগত্য না দেখিয়েই গড়ে তোলেন স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরশুট। তাঁকেই বলা হয় ভুরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। এতদিন যা ছিল কেবলই কথা তাকে বাস্তবে পরিণত করেন তিনি। তাঁর শক্তি ও বুদ্ধিকে ভয় পেতেন সকলে।

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণের মৃত্যুর পর ভুরশুটের সিংহাসনে একে একে বসেন তাঁর ছেলে দেবনারায়ণ ও নাতি দর্পনারায়ণ। দর্পনারায়ণের পর তাঁর ছেলে উদয়নারায়ণ বা নাতি সত্যনারায়ণ এবং তাঁর ছেলে শিবনারায়ণ সিংহাসনে বসলেও ভুরশুটকে আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী করার জন্য নাম করতে হয় তাঁর ছেলে রুদ্রনারায়ণের। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণনারায়ণের পর রায়মুখোটি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন রুদ্রনারায়ণ। বঙ্গের পাঠানদের ভ্রাস হয়ে ওঠেন তিনি। মিত্র হিসেবে বেছে নেন তিনি মুঘলদের। কিন্তু আশঙ্কার একটা কালো মেঘের ছায়া গাঢ় হচ্ছে তাঁর মুখে। তাঁর পরেই কি শেষ হয়ে যাবে রায়মুখোটি বংশের ধারা?

তাঁর আশঙ্কার কারণ, যৌবন তাঁর অতিক্রান্ত অথচ এখনো তিনি নিঃসন্তান। অপুত্রক, রানি অসুস্থ। সন্তান ধারণের কোনো ক্ষমতাই আর নেই তাঁর। রাজা তাঁকে ভালোবাসেন। তাই অন্য বিয়ের কথা ভাবতেই পারেন না। পারেন না বলেই শঙ্কাটা তাঁকে বিক্ষত করে চলেছে। এই শঙ্কা বা হৃদয়বেদনার কথা বলতে পারেননি কাউকেই। পারেন না বলেই রাজ্যশাসনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাধন-ভজনেও মন দেন। আর তারই জন্য রাজধানীর অদূরে কাটশাকড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন শিবমন্দির। সেই শিবমন্দিরেই মানসিক শান্তির খোঁজে তিনি কাটান অনেকটা সময়ই। এটাই হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনযাপনের একটি ধারা।

সেই ধারাই উত্তলা হলো সেদিন। মন্দিরে সাধনায় রত ছিলেন তিনি। এমন সময় এক সন্ন্যাসীর কণ্ঠ দিয়ে যেন ধ্বনিত

হলো দৈববাণী—আবার দারগ্রহণ করো। তুমি হবে সুপুত্রের পিতা।

সন্ন্যাসীর ওই কথাতেও ভরসা করতে পারেন না রুদ্রনারায়ণ। বয়স হয়েছে তাঁর। এসময় বিয়ে করা কি উচিত? করলেও কেই-বা মেয়ে দেবে তাঁকে? আজ এসব চিন্তাই অস্থির করে তোলে রুদ্রনারায়ণকে। মনের সেই অস্থির মুহূর্তে তাঁর একমাত্র আশ্রয় এই শিবমন্দির আর গুরু হরিদেব ভট্টাচার্য।

রাজগুরুই আশ্বস্ত করেন তাঁকে। বলেন, অযথা চিন্তা করো না। ঈশ্বরের লীলা বোঝা ভার। স্বয়ং বিশ্বনাথই হয়তো সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন তাঁর ইচ্ছার কথা। তাই বৃথা চিন্তা না করে আস্থা রাখো তাঁর কথায়। হৃদয় দিয়ে ডাকো দেবতাকে। দেখবে যা হবার তা ঘটবেই।

সেদিন ছিপে কাটশাঁকড়া যাওয়ার পথে এসবই ভাবছিলেন রুদ্রনারায়ণ। তাই আশপাশের কোনো কিছুই নজরে পড়ছিল না তাঁর। অকস্মাৎ এক আর্ত চিৎকার আর বন্যাপশুর তীব্র গর্জনে ভেঙে গেল তাঁর ঘোর। তিনি চোখ ফেরালেন নদীর পাড়ের দিকে। যা দেখলেন তাতে রক্ত যেন হিম হয়ে গেল তাঁর। চার চারটি বন্যমোষ তাড়া করেছে এক নারী ও তার সন্তানকে। সেই নারীর চিৎকার আর বুনো মোষের গর্জনে সচকিত রাজা রুদ্রনারায়ণ। ‘রক্ষা করতে হবে’—নিজের মনেই বলেন রাজা। নির্দেশ দেন, দ্রুত পাড়ে নৌকা ভেড়াতে।

তারই মধ্যে ঘটে আরেক অবাধ কাণ্ড। কানে আসে দ্রুতগামী অশ্বের ক্ষুরধ্বনি। তীব্র হুয়ারর। রাজা দেখেন অশ্বপৃষ্ঠে সশস্ত্র এক তরুণী। চোখের পলকে বর্শা ছুড়ে বিদ্ধ করে সামনে আগুয়ান মোষটিকে। লুটিয়ে পড়ে মোষ। এক আঘাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে তার।

তরুণী নামে ঘোড়ার পিঠ থেকে। ত্বরিতে মোষের মাথার বিদ্ধ বর্শা তুলে নিয়ে একে একে হত্যা করে বাকি তিনটিকে। প্রায় অবলীলায়। তারপর ওঠে পড়ে নিজের অশ্বে।

রাজা রুদ্রনারায়ণ অবাধ হয়ে দেখছিলেন তরুণীর কাণ্ড। নৌকা থেকে নেমে এগিয়ে আসেন তিনি তরুণীর দিকে। জিজ্ঞেস করেন, কে তুমি? তুমি কি কোনো ক্ষত্রিয় কন্যা? অস্ত্রবিদ্যায় এমন পারদর্শী হলে কীভাবে? আর একা একা এই বিপদসংকুল অরণ্যে এসেছো কী জন্য?

কপালের ঘাম মোছে তরুণী। রাজার ওই এক ঝাঁক প্রশ্নের মুখে ঘোড়ার পিঠেই বসে থাকে। একজন অপরিচিতের এমন প্রশ্নে বুঝিবা বিরক্ত। বিরতও বোধ হয়।

রাজা বুঝতে পারেন ব্যাপারটা। তাই বেশ শাস্ত গলায় বলেন, একজন অজানা লোকের এমন প্রশ্নে তুমি বোধহয় বিরক্ত হয়েছো। কিন্তু যে মেয়ে একা অসম সাহসে এমন অস্ত্র চালাতে পারে— তার তো এমন ইতস্তত করা সাজে না।

তরুণী ততক্ষণে স্বাভাবিক। সোজাসুজি তাকায় রাজার

দিকে। তাকিয়ে যেমন যেন লজ্জারাজ। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে বিনম্র কণ্ঠে বলে, ক্ষমা করবেন। আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারিনি। বছর চার আগে কাটশাঁকড়ার শিবমন্দিরে দেখেছিলাম আমাদের মহারাজকে। আপনি তো তিনিই।

হাসির ঝিলিক রুদ্রনারায়ণের মুখে। তরুণী বলেই চলে, উত্তেজনার বশে আপনাকে চিনতে পারিনি। তারজন্য আবারও ক্ষমা চাইছি।

ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। কিছু মনে করিনি আমি। বরং আমার রাজ্যে যে এমন সাহসী শাস্ত্রবিদ কোনো মেয়ে রয়েছে তা জেনে আনন্দই হচ্ছে। যাইহোক, এবার নিশ্চয় তোমার পরিচয় দিতে কোনো অসুবিধা নেই।

আবারও প্রণাম জানিয়ে বলে তরুণী, না মহারাজ। নাম আমার ভবশঙ্করী। আমার বাবা দীননাথ চৌধুরী আপনারই রাজ্যের পেড়ো দুর্গের অধ্যক্ষর একজন বরিষ্ঠ নায়ক। বুঝতেই পারছেন আমি কোনো ক্ষত্রিয় কন্যা নই। আমরা ব্রাহ্মণ। আমার যা কিছু শিক্ষাদীক্ষা সবই বাবার কাছে। তিনি আমাকে দিয়েছেন নানা শাস্ত্রে দীক্ষা, একই সঙ্গে শিক্ষিত করেছেন নানা শাস্ত্রেও।

আশা করি, আপনার সব জিজ্ঞাসারই উত্তর আমি দিয়েছি। এরপর নিশ্চয় আমাকে এস্থান ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। আর যাওয়ার আগে স্বীকার করছি, এভাবে একলা এই স্বাভাবিক ব্রীড়ার অনুরাগ ছড়িয়ে আছে সারা দেহে।

রাজা ইঙ্গিতেই যাওয়ার অনুমতি দেন। ভবশঙ্করী ধীর পায়েই এগিয়ে ওঠে তার ঘোড়ায়। এখন আর তার চেহারা কিছু আগের সাহসী এক যোদ্ধার দৃঢ়ভাব নেই। বরং নারীর স্বাভাবিক ব্রীড়ার অনুরাগ ছড়িয়ে আছে সারা দেহে।

রাজা অনুরাগ নয়নেই দেখেন ভবশঙ্করীর সেই চলে যাওয়া। বোঝেন, এ মেয়ে কেবল সাহসী বা অস্ত্রসঞ্চালনাতেই কুশলী নয়, এ মেয়ে শিষ্টাচারেও সমান সুশিক্ষিত।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই রাজা রুদ্রনারায়ণ আবার ওঠেন ছিপ নৌকায়। এখন আর তাঁর সেই উদ্দামভাব নেই। বরং ভিন্নতর এক চিন্তায় চঞ্চল তিনি। তিনি চান অবিলম্বে কাটশাঁকড়ায় তাঁর সাধনপীঠ সেই শিবমন্দিরে পৌঁছাতে। তাঁর মনে হয়, অনেক—অনেক কাজ পড়ে রয়েছে তাঁর। এখনি শেষ করতে হবে সব। তাই তাড়া দেন মল্লাদের।

কাটশাঁকড়ার শিবালয়ে যথারীতি শেষ হয় রাজা রুদ্রনারায়ণের শিবার্চনা। শেষ হয় অর্ঘ্য দান। কিন্তু দূর হয় না হৃদচাঞ্চল্য। বারবারই মনের পর্দায় স্পষ্ট হয় ভবশঙ্করীর মুখ। বরানার সার্বিক লাভণ্য চঞ্চল করে তোলে রাজাকে।

ভাবসংশ্লেষে চোখ বোজেন রাজা। আর ওই মুহূর্তে রাজার হৃদয়বীণায় বেজে আজানা সেই সন্ন্যাসীর কথা—আবার দার পরিগ্রহ করো তুমি। তাহলেই তুমি হবে সুপুত্রের জনক।

অব্যাহত থাকবে তোমার বংশ।

বারবার মনে হয় রুদ্রনারায়ণের, তাহলে ভবশঙ্করীই কি সেই নারী? এরই সঙ্গে কি জড়িয়ে রয়েছে ভুরশুটের ভবিষ্যৎ? কিন্তু—হ্যাঁ এই কিন্তুটাই বিচলিত করে রাজাকে। তিনি চাইলেও ভবশঙ্করীও কি চাইবে? দুজনের বয়সের বিরাট ফারাকটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো মিলনের পথে?

।। তিন ।।

মনের সেই অস্থির মুহূর্তেই রাজা রুদ্রনারায়ণ খবর পাঠালেন দীননাথ চৌধুরীর কাছে। অবিলম্বে ওই সময়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন তিনি।

নির্দেশ পেয়ে এতটুকু দেরি করলেন না দীননাথ। দু'জন দেহরক্ষী নিয়ে রণবেশে তিনি হাজির হলেন সেই শিবমন্দিরে। দেবতা ও রুদ্রনারায়ণকে প্রণাম করে বলেন, আমাকে ডেকেছেন মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ হাত ধরে তাঁকে বসালেন পাশে। কুশল বিনিময়ের পর জানতে চাইলেন পেড়ো এবং সম্মিহিত অঞ্চলের খবরাখবর। দীননাথও সব জানান তাঁকে। প্রজারা যে সুখে ও শান্তিতে রয়েছে একথাই নানাভাবে বলেন তিনি রুদ্রনারায়ণকে।

সব কিছু জানলেও দীননাথ কিন্তু ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত। মহারাজ যে অঞ্চলের খবরাখবর জানার জন্য তাঁকে তড়িঘড়ি ডেকে পাঠাননি এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। তাই প্রকৃত কথাটা জানার জন্য বেশ উদগ্রীবভাবে অপেক্ষা করতে থাকেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণ আসল কথাটা বলার আগে নানা প্রসঙ্গে কথাবার্তা চালান বেশ কিছুক্ষণ। তারপর একসময় আসেন আসল প্রসঙ্গে। বলেন কিছু মনে করবেন না। একটা ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে।

দীননাথ কোনো কথা না বলে তাকিয়ে থাকেন রাজার দিকে। একটু সময় নিয়ে রুদ্রনারায়ণ বলেন, আজ দুপুরে এখানে আসার সময় কুল-আকাশের কাছে নদীপাড়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার নজরে পড়ল। ঘটনাটা আমাকে বড়ই কৌতূহলী করে তুলেছে। চিন্তাও তাই বড়ো অস্থির। আপনি কি আমার এই চিন্তা চাঞ্চল্যকে দূর করতে একটু সাহায্য করবেন!

রাজা তখন যেন তৃষ্ণার্ত চাতক। তাকিয়ে আছেন ‘ফটিক জল’ দীননাথ চৌধুরীর দিকে। আর ঘটনার আকস্মিকতায় দীননাথও কিছুটা হতভম্ব। বুঝতে পারেন না এই মুহূর্তে তিনি ঠিক কী বলবেন। কেমন ভাবেই-বা রাজার অস্থির মনকে করবেন সুস্থির? বুঝতে পারেন না বলে তিনিও নীরব।

সাময়িক নীরবতা ভেঙে দীননাথই বলেন, কী হয়েছে মহারাজ? কী দেখেছেন আপনি?



দেখলাম এক তরুণীকে। অশ্বপুষ্ঠে অস্ত্রধারী। যেন সাক্ষাৎ দেবী। একাই নিধন করল চার চারটি বন্য মহিষকে। জিজ্ঞেস করলাম পরিচয়। লাজুক কণ্ঠে বলল, ওর নাম ভবশঙ্করী। আচ্ছা ও কি আপনার মেয়ে? বিয়ে হয়নি ওর এখনো?

দীননাথ বলেন, হ্যাঁ ও আমারই মেয়ে ভবশঙ্করী। ওর যখন বছর চার বয়স, সেই সময় পুত্রের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায় আমার স্ত্রী। তারপর থেকে ও সবসময় থাকে আমারই সঙ্গে। নানা শাস্ত্র ওর অধিগত। অস্ত্রবিদ্যাতেও সুনিপুণ। ও যে সুরুপা—তা তো আপনিও দেখেছেন।

—ও কি বিবাহিত?

—না মহারাজ। ওর বিয়ে হয়নি এখনও।

—কিন্তু বয়স তো হয়েছে।

—হ্যাঁ মহারাজ। সেটা আমিও জানি। তাই সময়েই বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু মেয়ে আমার অদ্ভুত এক শর্ত রেখেছে।

—কী রকম?

—বলেছে, অসি যুদ্ধে যে ওকে পরাজিত করতে পারবে, তাকেই ও বিয়ে করবে। আপনিই বলুন, ব্রাহ্মণের মধ্যে কি অমন পাত্র পাওয়া সহজ। তাই আমিও ভাবলুম—থাক ও আমার কাছে এই ভাবেই।

রুদ্রনারায়ণ বলেন, কিন্তু মেয়ের বিয়ে দেওয়াতো বাবার কর্তব্য। শাস্ত্রে তো সে কথাই বলে।

—জানি মহারাজ। কিন্তু বললাম যে মেয়ের পণের কথা।

—বুঝেছি। আপনি চিন্তা করবেন না। আমিই চেষ্টা করবো আপনার মেয়ের পাত্রের জন্য। খোঁজ পেলেই জানাবো আপনাকে। আপনি নিশ্চিন্ত মনেই এবার যেতে পারেন।

রাজাকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানিয়ে দীননাথ চৌধুরী ফিরে আসেন বাড়িতে। রাজার এই হঠাৎ করে ডেকে পাঠানো, ভবশঙ্করীর বিয়ের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা, এসবের কোনো অর্থই খুঁজে পান না দীননাথ। পান না বলেই তাঁর মনের মধ্যেই চলতে থাকে নানা প্রশ্ন—উত্তরের কাটাকাটি খেলা।

ওদিকে শিবমন্দিরে রাজা রুদ্রনারায়ণের মনের আকাশে তখন সাদা-কালো নানা মেঘের ঘনঘটা। সেই আলো-আঁধারি মানসিক অবস্থায় তিনি একটু উদ্ভ্রান্ত। বুঝি বারবারই পথ হারান। কিছুতেই খুঁজে পান না জীবনের সঠিক ঠিকানা। মনের সেই অস্থির অবস্থার মধ্যেই মনে হয় রুদ্রনারায়ণের—গুরুদেব—গুরুদেব হরিদেব ভট্টাচার্যই তাঁকে দিতে পারবেন সঠিক পথের সন্ধান। আর এটা মনে হতেই রুদ্রনারায়ণ শান্ত। শান্ত মনেই তিনি যান গুরুদেবের কাছে।

রাজগুরু হরিদেবের কাছে অকপট রাজা রুদ্রনারায়ণ।

বলেন তাঁকে সব ঘটনাই—এতটুকু ফাঁক না রেখেই। তরুণী ভবশঙ্করী যে তাঁর মনে বাড় তুলেছে সে কথাও গোপন রাখেন না তিনি।

রাজগুরুকে সব কথা বলে একটু যেন হালকা হন রাজা রুদ্রনারায়ণ। তারপর তাঁর সংশয় ভরা প্রশ্ন, এবার আপনিই বলুন, আমি কী করব? এই মেয়েকে দেখে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সিদ্ধান্তটা আমি প্রায় নিয়েই ফেলেছি। কিন্তু ওই কন্যা যে পণ করেছে, তার আমি কী করব? রাজা আমি। আমার কি সাধারণ একটি মেয়ের সঙ্গে অসিযুদ্ধ করা মানায়? আমি জানি, ওই মেয়ে অসি চালনায় কুশলী হলেও আমাকে পরাজিত করা ওর পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না। কিন্তু দৈবের কথা তো বলা যায় না, যদি আমি হেরে যাই, তাহলে সে যে বড়ো কলঙ্কের ব্যাপার হবে। আপনিই বলুন গুরুদেব এখন আমার কী কর্তব্য।

শাস্ত গলাতেই বলেন হরিদেব, অত উতলা হচ্ছে কেন? আমায় তো বললে সব কথা। আমি যতটুকু বুঝতে পারছি, তাতে বলতে পারি, ভবশঙ্করী হবে ভুরগুট রাজ্যের পরবর্তী রানি। সেই হবে তোমার পুত্রের জননী। কিন্তু সব কিছুই জন্মই তো একটু সময়ের প্রয়োজন। দরকার একটু ধৈর্যের। তাই বলছি শান্ত হও। আমি দেখছি কী করতে পারি। যাতে ওই মেয়ের ধনুকভাঙা পণ রক্ষা হয় আর তোমাকেও ওর সঙ্গে অসিযুদ্ধে নামতে না হয় তার একটা ব্যবস্থা আমি করছি।

বিদায় নেন রাজা। হরিদেবও তাঁর পরবর্তী কর্তব্য হিসেবেই রওনা হন দীননাথ চৌধুরীর বাড়ির দিকে। অসময়ে রাজগুরুকে আসতে দেখে দীননাথ একটু চিন্তায় পড়েন। প্রণাম করে তাঁর বসার জন্য যোগ্য আসন দিয়ে বলেন, আপনার পায়ের ধুলো পড়ায় পবিত্র হলো আমার গৃহ। কিন্তু আপনি কষ্ট করে আসতে গেলেন কেন? বললে আমি তো যেতে পারতাম আপনার কাছে।

হেসে বলেন হরিদেব, অত ব্যস্ত হয়ে না। একটা বিশেষ কাজে এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম এই ফাঁকে তোমার বাড়িও একটু ঘুরে যাই।

দীননাথ বলেন সে তো আমার পরমসৌভাগ্য। বলুন, এখন আপনার সেবার জন্য কী করতে পারি।

অত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আমি এসেছি এমনিই। তা তোমার সব কুশল তো। ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে?

—হ্যাঁ গুরুদেব, এখানে সবই কুশল। ছেলে-মেয়েরাও ভালোই আছে।

—বেশ, বেশ। তা তোমার মেয়েকে দেখছি না! ও কোথায়?

—ও আছে বাড়ির ভিতরেই। শুনে হরিদেব বলেন, দেখো তোমাকে একটা কথা বলি। মেয়ে বড়ো হয়েছে। এখন ওর বিয়ে দেওয়া উচিত। তুমি সং ও ধার্মিক মানুষ। তোমার তো এভাবে মেয়েকে ঘরে রাখা উচিত নয়। মেয়ের বিয়ের জন্য

উদ্যোগ নাও এবার।

কুণ্ঠিত ভাবেই দীননাথ বলেন, আপনি তো সবই জানেন। ওর পণের কথাও অজানা নয় আপনার। মা-মরা মেয়ে—এই নিয়ে আমি তো জোর করতে পারি না। মুশকিল হচ্ছে, ব্রাহ্মণের মধ্যে অমন উপযুক্ত পাত্র তো একটিও পাচ্ছি না।

হরিদেব হেসে বলেন, সে কী কথা। পাত্র তো তোমার হাতের কাছেই রয়েছে।

গুরুদেবের কথায় বিভ্রান্ত দীননাথ বলেন, ঠিক বুঝলাম না। কোথায় রয়েছে অমন পাত্র?

হরিদেব একইভাবে বলেন, কেন রাজা রুদ্রনারায়ণ। এতদিনে তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহে রাজি হয়েছেন। তাঁরই সঙ্গে বিয়ে হতে পারে তোমার মেয়ে ভবশঙ্করীর।

—রাজা রুদ্রনারায়ণ! আমাদের মহারাজা। একী কথা বলছেন আপনি। তিনি গ্রহণ করবেন আমার মেয়েকে। তাও কখনো হয়!

—হয় বলেই তো তোমার কাছে এলাম। তুমি আর তোমার মেয়ে রাজি থাকলেই হয়ে যেতে পারে বিয়েটা।

দীননাথ বলেন, এ তো হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতো ব্যাপার! কিন্তু—

—আবার কিন্তু কীসের?

—আপনি তো জানেন, মেয়ের আমার পণের কথা। তাছাড়া ও সুশিক্ষিতা। বড়ো হয়েছে। ওর নিজের একটা মতামত রয়েছে। তাই—

হরিদেব বলেন সে তোমাকে ভাবতে হবে না। মেয়ে তো তোমার ঘরেই আছে, ডাকো তাকে। আমি কথা বলব ওর সঙ্গে।

দীননাথ ডেকে আনেন ভবশঙ্করীকে। গুরুদেবকে প্রণাম করে নতমুখে একপাশে দাঁড়ায় ভবশঙ্করী। হরিদেব বলেন মা, আজ তোমাকে একটা কথা বলি। রাজা রুদ্রনারায়ণ আবার বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন। আমার ইচ্ছা, তোমার সঙ্গে তাঁর বিয়েটা হোক। আশা করি এতে তোমার কোনো আপত্তি নেই।

নতমুখেই ভবশঙ্করী জানায়, স্বামী হিসেবে যে কোনো মেয়েই রাজা রুদ্রনারায়ণকে কামনা করবেন। কিন্তু আমি পণ করেছিলাম—

—জানি মা। সবই শুনেছি তোমার বাবার কাছে। শুনে ব্যাপারটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। বিয়ের আগে প্রতিটি মেয়েরই তো জানা উচিত, জীবনসঙ্গী বলবীর্ষে তার চেয়ে কতটা উন্নত। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। ভেবে দেখো, রাজা রুদ্রনারায়ণ যে মহাবীর একথা সকলেই জানে। অসি চালনায় তাঁর চেয়ে দক্ষ অন্তত এই বঙ্গদেশে আর কেউ নেই। এহেন ব্যক্তির পক্ষে তোমার সঙ্গে অসিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় নামা একটু অপমানজনক নয় কি? তুমিই বলো।

রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্যের একথার কোনো উত্তর দিতে

পারে না ভবশঙ্করী। তাই মাথা নীচু করেই থাকে সে। তার ওই অবস্থা দেখে হরিদেব ভট্টাচার্য আবারও বলেন, রাজার শক্তি এবং অসি চালানার দক্ষতা সম্পর্কে আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। একবার রাজপ্রসাদে অসি চালনা নিয়ে একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। দেশ-বিদেশ থেকেও এসেছিলেন বহু কুশলী অসি চালনাকারী। তোমার বাবাও ছিলেন একজন প্রতিযোগী। সে প্রতিযোগিতায় সকলেই হার মেনেছিল রাজা রুদ্রনারায়ণের কাছে। আমার কথায় কোনো অতিরঞ্জন আছে কিনা সেটা তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝতে পারবে।

এসবের পর আর কিছুই বলার থাকে না ভবশঙ্করীর। তাই বিয়ের কথায় সম্মতি জানায়। কিন্তু করে একটা অনুরোধ। বলে বিয়ের আগে রাজবল্লভীর মন্দিরে এক বিশেষ পূজার আয়োজন করা হোক। সেখানে বলির জন্য দু'জায়গায় রাখা হোক দুটি করে মহিষ ও একটি করে মেঘ। আমরা দু'জনে বলি দেব সে পশু। তারপর সেখানেই মহামায়ার সামনে পতিত্রে বরণ করব রাজা রুদ্রনারায়ণকে।

ভবশঙ্করীর একথায় রাজি হন হরিদেব ভট্টাচার্য। আর তাই নির্দিষ্ট দিনেই হয় ওই পূজা। এবং হয়ে যায় শুভবিবাহ।

॥ চার ॥

এ এক পর্বান্তর। সবকিছু ওলটপালট করে দেওয়া। সব মানুষের জীবনেই কোনো না কোনোভাবে এটা ঘটে। কিন্তু ভারতের নারীদের জীবনে এটা অনিবার্য। প্রকৃতপক্ষে নারীজীবনে সবকিছু টালমাটাল করা একটা ব্যবস্থা হলো বিবাহ। রাতারাতি সবকিছু বদলে যায়। যা ছিল তার একান্ত আপন এবং পরম ভরসার জায়গা, সেই নিরাপদ নীড় ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয় নারীকে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে। ভবশঙ্করীর জীবনেও ঘটল তাই।

ভবশঙ্করী ছিলেন বাবার নয়নমণি। শৈশবে মা-কে হারিয়ে বাবা দীননাথের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন একই সঙ্গে বাবা ও মাকে। স্বাধীন বনবালার মতোই যাপন করছিলেন মুক্ত বিহঙ্গ জীবন। বিদ্যা ও অস্ত্র, দু'য়ের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ভবশঙ্করী অরণ্যের মধ্যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন জীবনের নানা পরমধন। কিন্তু বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল সব কিছু।

ভবশঙ্করী ছিলেন একজন সেনানায়ক বা সর্দারের মেয়ে। সমৃদ্ধি থাকলেও ছিল একটা সীমা। কিন্তু রাজা রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে বিয়ের মুহূর্ত থেকে তিনি হলেন রানি ভবশঙ্করী। দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রানি থেকে হলেন রানিমা। প্রজাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশে তিনি হলেন মা জগদ্ধাত্রী। প্রচলিত শান

বাঁধানো সড়ক ছেড়ে মেঠো রাস্তায় নেমে ভবশঙ্করী তৈরি করে ফেলেন নিজস্ব এক ভাবমূর্তি—অতি দ্রুতই।

রাজা রুদ্রনারায়ণ সতিই বড়ো বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলেন তাঁর এই দ্বিতীয়ােকে। সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় রীতিমতো বেশি বয়সেই রুদ্রনারায়ণ বিয়ে করেছিলেন ভবশঙ্করীকে। কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি বিদ্ধ হন কামশরে। বিয়ের পরে পরেই তিনি ভবশঙ্করীর জন্য ভবানীপুরের গড়ের বাইরে দামোদরের তীরে তৈরি করেন এক বিরাট প্রাসাদ। সেখানেই ভবশঙ্করী থাকেন প্রায় স্বাধীনভাবে। সেখানেই রুদ্রনারায়ণ তাঁর সঙ্গে খেলেন নিত্য মদনোৎসবে।

ভবশঙ্করী কেবল রূপসী, সাহসী, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণই ছিলেন না, বিভিন্ন শাস্ত্রেও ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত। তিনি ছিলেন এককথায় বিদ্যাবতী সরস্বতী। দর্শনশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা ভবশঙ্করী জানতেন, এ জীবন হলো পদ্মপাতার জল। তাই যা করবার তা করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। কোনোমতেই আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখা উচিত নয়। তাই বিয়ের পর কেবলই প্রেমের জোয়ারে ভাসা নয়, সেই সঙ্গে স্বামীকে সমস্তকাজে সবারকমভাবে সাহায্য করার জন্য সতত সক্রিয় থাকতেন।

ভবশঙ্করী তাঁর দাম্পত্য জীবনের আদর্শ যেন খুঁজে পেয়েছিলেন কালিদাসের ‘রঘুবংশম্’ কাব্যে। ‘গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ’—অর্থাৎ ‘গৃহিণী, সচিব, রহস্যসখী মম, ললিতকলায় ছিল যে শিষ্যসম’ নীতিতে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বিয়ের পর থেকে ভবশঙ্করীই হয়ে ওঠেন রাজার প্রধান পরামর্শদাতা।

এমনিতেই রাজা রুদ্রনারায়ণের সেনাবাহিনী ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। হস্তী, অশ্ব, পদাতিক ও নৌবহর—এই চার বাহিনীর শক্তিতে তিনি ছিলেন প্রায় অপরায়েজ। এই বাহিনীর কারণেই তিনি প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্যশাসন করতেন। ভবশঙ্করী সেই বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার দিকে নজর দিলেন।

একইসঙ্গে নিজের প্রাসাদেই আলাদাভাবে গড়ে তোলেন এক নারী বাহিনী। সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধে এই বাহিনী ছিল অতি পারদর্শী। শুধু যে নারীবাহিনী গঠন করেন তা নয়, সেইসঙ্গে ব্রাহ্মণ ছাড়া সব বর্ণের সক্ষম যুবকদের সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে তিনি এক অনন্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সেনা সংগঠন ছাড়া রাজ্যের নানা জায়গায় দুর্গ তৈরির যে পরিকল্পনা তিনি নেন, রুদ্রনারায়ণ দ্রুত সেগুলির বাস্তবায়ন ঘটান। এই পরিকল্পনাতেই তারকেশ্বরের কাছে ছাউনাপুর নামে খ্যাত জায়গায় যে ভূগর্ভস্থ দুর্গ তৈরি করান, তা রানির দূরদর্শিতার একটি বড়ো পরিচয়।

ছাউনাপুরে এই দুর্গ ছাড়াও গড়ের বাইরে রানি ভবশঙ্করী এক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নামে মন্দির হলেও মন্দিরের

ভিতরে ছিল নানা গুপ্ত জায়গা—যা একরকম দুর্ভেদ্য দুর্গেরই প্রতিকল্প। প্রয়োজনে রানি এই মন্দিরকেই তাঁর সাময়িক বাসস্থান হিসেবেও ব্যবহার করতেন।

রানি ভবশঙ্করীর আরাধ্যা ছিলেন দেবী ভবানী। বাগুড়ী গ্রামে তিনি তাঁর ইস্টদেবীর নামে প্রতিষ্ঠা করেন ওই ভবানী মন্দির।

কেবল দুর্গ বা দেবালয় নয়, রানি ভবশঙ্করী নিজে ঘোড়ায় চড়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত যেতেন। সাধারণ মানুষের কাছে শুনতেন তাদের অভাব অভিযোগের কথা। শুনেই কর্তব্য শেষ হতো না তাঁর। বরং সে সব অভিযোগের প্রতিকার করতেন তিনি। তাঁর এইসব চেষ্টার ফলেই রাজ্যে কৃষি, বস্ত্রবয়ন ও খাদ্যপত্র ইত্যাদি শিল্পের উন্নতি ঘটতে থাকে। আর এসবের ফলেই সারা রাজ্যই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। দূর হয় দুঃখদারিদ্র। প্রজারাও দিন কাটাতে থাকেন সুখেই। শিল্প সমৃদ্ধির কারণেই ভুরশুট হয়ে ওঠে সারা দেশের মধ্যে এক আদর্শ রাজ্য।

॥ পাঁচ ॥

ভবশঙ্করীর জীবনকালকে মোটামুটি চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব তাঁর কুমারী কাল, দ্বিতীয় পর্ব বিয়ের পর থেকে রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু পর্যন্ত সময়, তৃতীয় পর্ব রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকে প্রতাপনারায়ণের অভিষেক কাল পর্যন্ত এবং চতুর্থ পর্বের বিস্তৃতি রানি ভবশঙ্করীর কাশীবাস থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

রানি ভবশঙ্করীর দাম্পত্যজীবন মোটেই দীর্ঘ নয়। পুত্র প্রতাপনারায়ণের বয়স যখন বছর পাঁচেক, সেইসময় হঠাৎই মারা যান রাজা রুদ্রনারায়ণ। রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন রানি ভবশঙ্করী মানসিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। ওইসময় রাজ্য শাসনের ব্যাপারে তিনি একবারেই উদাসীন ছিলেন। শুধু তাই নয়, রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর ভবশঙ্করী সহমরণে পর্যন্ত যেতে চান।

রানি ভবশঙ্করীর শোকের সময় সবদিক থেকে রানির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে শক্তি জোগান রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য। ওইসময় তাঁর ভূমিকা দেখে বোঝা যায়, রাজগুরু কেবল আধ্যাত্মিক শক্তিরই অধিকারী ছিলেন না, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি ভুরশুট রাজ্যে রায় রাজবংশের শাসনকেই কেবল অক্ষুণ্ণ রাখেননি। সেইসঙ্গে বঙ্গদেশে পাঠান শাসনের অবসানের ভিত্তিও তৈরি করে দেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর রানি ভবশঙ্করী যখন মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, সেসময় হরিদেব

নানাভাবেই তাঁকে সান্তনা দিয়ে সক্রিয় করার চেষ্টা চালিয়ে যান।

প্রাথমিকভাবে, গুরুদেবের সেসব কথায় কোনো সাড়া দেননি ভবশঙ্করী। হরিদেব তাঁকে বোঝান, রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুতে কেবল ভুরশুটে নয়, সমগ্র বঙ্গদেশেই মহাসংকট দেখা দিয়েছে। বলেন, তুমি তো জানো, বঙ্গদেশের অধিকার নিয়ে এখন মুঘল ও পাঠানদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। পাঠানরা মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তোমার স্বামী রুদ্রনারায়ণের সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু রুদ্রনারায়ণ পাঠানদের সেই আহ্বানে সাড়া দেননি। নিরপেক্ষ ভূমিকা নিলেও তাঁর সমর্থন ছিল মুঘলদের প্রতিই। তাদের সাহায্য করে নানাভাবে।

রুদ্রনারায়ণকে পাশে না পেয়ে পাঠানরা খুবই ক্ষিপ্ত। তারা বিভিন্ন সময়ে ভুরশুট রাজ্য আক্রমণও করে। কিন্তু প্রতিবারই ভুরশুট তথা রুদ্রনারায়ণের বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়।

পরাজিত হলেও এই রাজ্যের প্রতি পাঠানদের রাগ এতটুকু কমেনি। তাই তারা যদি শোনে রুদ্রনারায়ণশূন্য ভুরশুটের রানিও রাজ্য শাসন সম্পর্কে উদাসীন এবং তাঁর ছেলেও মাত্র বছর পাঁচেকের শাসক মাত্র, তাহলে তারা এই রাজ্য আক্রমণ করতে পারে। তুমি যদি তৎপর না থাকো অথবা সৈন্যবাহিনীকে নেতৃত্ব না দাও তাহলে ভুরশুটের ভবিষ্যৎ ঘন অন্ধকারে ডুবে যাবে। মুছে যাবে তোমার স্বামীর সব স্মৃতি। প্রতাপও সিংহাসনে বসার কোনো সুযোগই পাবে না। সবমিলিয়ে বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরাজ্য ধ্বংস হবে। বিপন্ন হবে অসহায় প্রজারা। এখন ভেবে দেখো, তুমি কী করবে? শোকের সাগরে ভেসে তোমার স্বামীর সব কীর্তিকে ধ্বংস হতে দেখবে নাকি তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শাসন দণ্ডটা হাতে তুলে নেবে?

রানি বিচলিত। তার আগের সিদ্ধান্ত টলমল। আর সেটা বুঝতে পেরেই রাজগুরু হরিদেব আরও আবেগভরা কণ্ঠে বলতে থাকেন, মা, তুমি তো সব শাস্ত্রই পড়েছো। তুমি তো জানো, এই শরীর নশ্বর কিন্তু এই শরীরস্থিত আত্মা অবিনশ্বর। স্বামীর নশ্বর দেহ বিনষ্ট হয়েছে বলে তুমি তোমার স্বামীর অবিনশ্বর আত্মার অমর্যাদা করবে? যার প্রতি ভালোবাসা তুমি এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছো, এতে যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাবে সেই অবিনশ্বর আত্মাই। তুমি তাই চাও?

রাজগুরু হরিদেবের অকাট্যযুক্তি এবং সপ্রণয় শাসন বাক্যে ভবশঙ্করী চোখের জল মুছে বলেন, আপনি তাহলে আমাকে কী করতে বলছেন?

হরিদেব এখন শান্ত। রানির ওপর তাঁর কথা যে প্রভাব ফেলতে ফেরেছে তা বুঝতে পেরেই তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, ওঠো, জাগো, লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাও। প্রতাপ যতদিন না উপযুক্ত হচ্ছে ততদিন এই রাজ্যরঞ্জক শক্তি হাতে ধরো। রাজা নেই কিন্তু তুমি আছো— এই কথাটাই জানিয়ে দাও সকলকে।

রাজগুরুকে প্রণাম করে ভবশঙ্করী বলেন, তাই হবে। আপনার আদেশই মেনে নিচ্ছি। তবে একটা কথা, এখন থেকে আমি থাকবো কাটশাঁকড়ায় আমার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে। জীবনযাপন করবো ব্রহ্মচারিণীর। রাজ্যের শাসনভার আপাতত থাকবে মন্ত্রী দুর্লভ চন্দ্র দত্ত এবং সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীর উপর।

ভবশঙ্করীর এই কথায় আবার আঁধার রাজগুরুর মুখ। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠেই তিনি বলেন, সবই তোমার জানা। এইমুহূর্তে হয়তো বিস্মরণ হয়েছে তা। মানুষের তৃতীয় রিপু লোভ বড়ো সাংঘাতিক। সামনে সাজানো নানা ধরনের মিষ্টি দেখে অতিবড়ো সংযমীর চিত্ত হয় চঞ্চল। কোনো অদৃশ্য জায়গা থেকে এসে ভিড় করে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি। এভাবে অন্যকে বিশ্বাস করে অতীতে বিপর্যস্ত হয়েছেন অনেকেই। অন্যসব লোভের মধ্যে রাজ্যলোভ বড়ো ভয়ানক। জানো তো, রাজ্যলোভী কান্যকুব্জ-রাজ জয়চন্দ্রের নানা হীন চক্রান্তের ফলে পরাজিত হন রাজা পৃথ্বীরাজ। আর তাতেই আগলহীন হয় এদেশে মুসলমান আগ্রাসনের সদর দরজাটা। এইভাবে পরনির্ভর ও যুক্তিহীন বিশ্বাসের কারণেই বঙ্গাধীশ লক্ষ্মণ সেনকে অনায়াসে পরাজিত করে বখতিয়ার খিলজির মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী। তাই বলছি, রাজ্যশাসনের ব্যাপারে কারও ওপর শর্তহীন নির্ভর হতে নেই। বিশ্বাসও করতে নেই।

ভবশঙ্করী এবার কিছুটা ধ্বস্ত কণ্ঠেই বলেন, তাহলে এ সংস্কারে বিশ্বাসের কি কোনো দাম নেই? অবিশ্বাসের খাদ না মেশানো কি শক্তপোক্ত বা উজ্জ্বল হবে না বিশ্বাসের সোনা।

হরিদেব বলেন, ঠিকই বুঝেছো মা। এবার তুমি পরম কর্তব্যের ডাকে সাড়া দাও।

—বেশ, আপনার কথাই মেনে নিচ্ছি। তবে এই শোক নিরসনে মাস তিনেক আমি কাটশাঁকড়ার ওই শিবমন্দিরে একা থাকতে চাই। মাত্র তিনমাস। ওইটুকু সময় আমাকে রাজপ্রসাদের বাইরে থাকার অনুমতি দিন। তারপর আপনার কথামতোই হবে সব কাজ।

কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গেই রাজগুরু বলেন, আবারও বলছি, এ কাজে আমার মানসিক সায় নেই। তবুও তুমি যখন একান্তই চাইছো, তাই হোক। তবে খুব সাবধান। আত্মরক্ষার ব্যাপারে এতটুকু উদাসীন হবে না। সবসময় নিজেকে সুরক্ষিত রাখবে। কাউকেই অতিবিশ্বাস করবে না—সে যেই-ই হোক। আমিও লক্ষ্য রাখবো। কোনো বিপদের গন্ধ পেলেই জানাবো তোমাকে। তখন কিন্তু বাঘিনির মতোই রুখে দাঁড়াবে। বলতে পারো এটা আমার নির্দেশ।

রাজগুরুর চরণ বন্দনা করে ভবশঙ্করী বলেন, আপনার কথার কোনো অন্যথা হবে না। সব দিকেই নজর রাখবো আমি। আপনি আর কোনো চিন্তা করবেন না।

‘বেশ মা, তাই হোক। শুভ হোক তোমার এই যাত্রা।’ রানিকে আবার আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় নেন রাজগুরু।

মন্ত্রী দুর্লভ দত্ত আর সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীকেই তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজকার্য চালাবার নির্দেশ দিয়ে রানি ভবশঙ্করী রওনা হন কাটশাঁকড়ায়। সঙ্গে নিলেন তাঁর নারী বাহিনীর অতি বিশ্বস্ত ও রণনিপুণ জনা কুড়ি সহচরীকে। আর নিলেন রাজবংশের কুলদেবী জয়দুর্গার আশীর্বাদী সেই দিব্য তরবারি।

বিয়ের কিছুদিন পরের ঘটনা। ভবশঙ্করী ধরনা দিলেন কুলদেবী জয়দুর্গার অষ্টধাতুর প্রতিমার সামনে। অনাহারে—বিনিদ্রভাবে ডেকে চলেছেন তিনি দেবীকে। একটা প্রার্থনা, কোনো বীরপুরুষ যেন তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করতে না পারেন।

কেটে যায় দুটি দিন। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্ন পূজার পর পেলেন দেবীর নির্দেশ, রাজবাড়ির পূর্বদিকের সরোবরে আছে একটি তরবারি। সরোবরে ডুব দিলেই সেটি আসবে তোর হাতে। সেই তরবারি যতক্ষণ থাকবে তোর হাতে, কেউ তোর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

দেবীর নির্দেশ মতোই সেই মধ্যাহ্নে সরোবরে ডুব দেন রানি। আর অলৌকিকভাবেই তার হাতে আসে এক মণিময় তরবারি। সেটি নিয়ে ভবশঙ্করী যান কাটশাঁকড়ার শিবালয়ে নিভৃত সাধনায়।

॥ ছয় ॥

রাজগুরুর আশঙ্কাই সত্যি হলো। চক্রান্তের জাল বোনার কাজ শুরু করেছিল ওড়িশার পাঠান অধিপতি ওসমান খাঁ। রাজা রুদ্রনারায়ণের জন্যই যে বঙ্গদেশে পাঠানরা ক্ষমতা হারাচ্ছে, এ দুঃখ ভুলতে পারে না ওসমান খাঁ। কতলু খাঁর পরাজয় ও নিধনের জন্যও রুদ্রনারায়ণ দায়ী বলে মনে করে সে। তাই রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর খবর পেয়েই তৎপর হলো ওসমান খাঁ।

ওসমান খবর পেয়েছে ভুরগুটির রাজ্যপাট সামলাচ্ছেন এখন সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তী। মাথার ওপর মন্ত্রী দুর্লভ দত্ত থাকলেও ক্ষমতার আসন চাবিকাঠি রয়েছে চতুর্ভুজেরই হাতে। রাজ্যের উত্তরাধিকারী প্রতাপনারায়ণ নেহাতই বালক। রানি ভবশঙ্করী এই মুহূর্তে পতিশোকে রয়েছেন রাজধানী থেকে দূরে এক শিবালয়ে। এই মুহূর্তে ভুরগুটি আক্রমণ করলে যে তার পতন হবেই সে সম্পর্কে নিশ্চিত ওসমান। তবুও প্রথমেই আক্রমণের রাস্তায় গেল না সে। বরং রাজনীতির কুটকৌশল হিসেবে বিশ্বাসঘাতক খোঁজার কাজে মন দিল।

ওড়িশা শাসক জানে ভুরগুটির সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তী বীর। খবর পেয়েছে, সংশয়াতীত বীরত্বের অধিকারী হলেও নিঃশর্ত আনুগত্য নেই তাঁর রাজার প্রতি। এক ধরনের লোভ

তাঁর মধ্যে তীর হয়ে চলেছে রাজার অজান্তেই। তাই টোপ ফেলে চতুর্ভুজের কাছে। রণনীতিতে অভিজ্ঞ ওসমান জানে প্রতিপক্ষের শিবিরে যদি বিশ্বাসঘাতক থাকে তাহলে যুদ্ধজয়টা অনেক অনায়াস হয়। তাই এক হিন্দু দূতকে পাঠালো চতুর্ভুজের কাছে।

গোপন কক্ষে শুরু হলো আলোচনা। দূত শুরুতেই চতুর্ভুজের সামনে মেলে ধরে প্রলোভনের তাসগুলি। দূত জানায়, ওসমান খাঁ বলেছেন, চতুর্ভুজ যদি তাঁর অধীনস্থ সেনাদের নিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন তাহলে প্রতিদানে তিনিও তাঁকেই ভুরশুটের রাজপদে অভিষিক্ত করবেন।

ওসমান খাঁর এই আকস্মিক প্রস্তাব চঞ্চল করে তোলে চতুর্ভুজকে। এটা যে তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন। গোপনে নানা চেষ্টা করেছেন কিন্তু সফল হননি। এবার বোধহয় ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন। তাই তিনিই বোধহয় ওসমান খাঁকে দিয়ে প্রস্তাবটা পাঠিয়েছেন।

চতুর্ভুজ ভেবে বলেন, অবস্থা এখন অনেক অনুকূল। রাজা রুদ্রনারায়ণ প্রয়াত। রানি ভবশঙ্করী বীরঙ্গনা, রাজনৈতিক জ্ঞানও প্রখর। কিন্তু স্বামীশোকে পার্থিব সবকিছু সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে রাজধানী থেকে দূরে ধর্মকর্ম করছেন। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রতাপনারায়ণ নেহাতই বালক। এরকম অবস্থায় ওসমান খাঁর এই বার্তা চতুর্ভুজকে সিংহের ভুজাবশেষ দেখে লালায়িত শিয়ালের মতোই চঞ্চল করে তোলে।

লোভ তীর হলেও চতুর্ভুজ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হন না। তাঁর অভিজ্ঞতাই তাঁকে বলে, হট করে কোনো কথায় হ্যাঁ বলতে নেই। প্রস্তাবটা কতটা খাঁটি তা ভালো করে যাচাই করে দেখা দরকার। এই মুহূর্তে ওসমান খাঁর বঙ্গদেশ আক্রমণের সম্ভাবনাটাও খতিয়ে দেখা উচিত। তাই একটু সময় নেন তিনি।

ওসমান খাঁর দূতও কুশলী কূটনীতিজ্ঞ। তাই চতুর্ভুজের ভাবনাকিছুগুলি পড়তে পারে সে তাঁর মুখ দেখেই। তাই আশ্রয় নেয় বাকচাতুর্যের। বলে, মান্দারণের যে যুদ্ধে পাঠান অধিপতি কতলু খাঁ পরাজিত ও নিহত হয়, তার আসল নায়ক ছিলেন চতুর্ভুজই। তাঁরই অসাধারণ বীরত্ব ও রণকৌশলে পরাজিত হয় পাঠানরা। অথচ সে যুদ্ধের পুরো কৃতিত্বটাই নেন রাজা রুদ্রনারায়ণ। চতুর্ভুজকে স্বীকৃতি দেওয়া দূরে থাক, যোগ্য মর্যাদাটাও দেন না। তাই প্রশ্ন, কতদিন—আর কতদিন জীবনপণ যুদ্ধ করেও চতুর্ভুজ এভাবে থাকবেন বঞ্চিতদের দলে—সেটাই জানতে চায় ওসমান খাঁর দূত। বলে, এখনই সঠিক সময়। এখনও যদি তিনি এগিয়ে না আসেন তাহলে আর কোনোদিনই তাঁর পক্ষে ভুরশুটের সিংহাসনে বসা সম্ভব হবে না। তাই এগিয়ে আসুন। যোগ দিন পাঠানদের সঙ্গে এটাই চায় ওসমান খাঁ।

দূতের এসব কথায় চতুর্ভুজ আর তাঁর মনের ইচ্ছাটা গোপন

করতে পারেন না। জানতে চান, সত্যি সত্যিই ওসমান একথা বলেছে তো? আমাকেই ভুরশুটের রাজা করবে তো?

দূত বলে, এর মধ্যে ছলাকলার কোনো জায়গা নেই। আল্লাহের নামে কসম খেয়েই কথাটা বলেছেন ওসমান খাঁ। আপনি সাহায্য করবেন তাঁকে আর তিনিও রাজপদে বসাবেন আপনাকে।

এমন স্পষ্ট আশ্বাস পেয়ে চতুর্ভুজ আর নিজের মনের ভাবটা চেপে রাখতে পারেন না। তিনি রাজি হয়ে যান। কারণ তিনি যতটা বোঝেন, ততে রানি ভবশঙ্করী কখনই তাঁর স্বামীর পথ থেকে সরে আসবেন না। আর তাই সবচেয়ে আগে তাঁকে বন্দি করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আর সেটা করার একটা রাস্তা জানা আছে তাঁর। এখন ওসমান খাঁ রাজি থাকলে সে পথটা করতে পারেন তিনি।

দূত জানতে চান পথটা। উত্তরে চতুর্ভুজ বলেন, রানি ভবশঙ্করী এখন অল্প কয়েকজন মাত্র দেহরক্ষী নিয়ে কাটশাকড়ার শিবমন্দিরে দিন কাটাচ্ছেন। তাই ওসমান খাঁ যদি রাতের অন্ধকারে অল্পকিছু সেনা নিয়ে হানা দেয় তাহলে সহজেই বন্দি করতে পারবে রানিকে। আর এতে যে তাঁর কোনো ভূমিকা রয়েছে এককথাও কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

দূত বলেন, হিন্দু হয়ে হিন্দুর এতবড়ো সর্বনাশ আপনি সত্যিই করবেন?

হাসেন চতুর্ভুজ। বলেন, ব্যক্তিস্বার্থে সবকিছুই করা যায়। এতে কোনো পাপ হয় না।

চতুর্ভুজের কথায় চোখ মটকে নিঃশব্দে একটা ফিচেল হাসি হাসে দূত। তারপর হাত মেলান দুজনে। বলেন, তাহলে বাত পাক্স। এখুনি ওড়িশায় ফিরে সবকথা জানাবে ওসমান খাঁকে। আপনার কথামতোই করা হবে সব। তবে হুঁশিয়ার, শেষ মুহূর্তে বেইমানি করলে জীবন দিয়ে মূল্য চোকাতে হবে। কথাটা মনে রাখবেন।

দ্রুতই ওড়িশায় ফেরে দূত। তার মুখে সব শুনে ওসমান খাঁ বিড়বিড় করে বলে, কমবখত। দোজাখের কীট। শয়তান লোকটার এতটুকু ধর্মভয় নেই। রাজি হয়ে গেল এক কথায়। না—না, এমন বেইমানকে পুরো বিশ্বাস করা উচিত নয়। তবে আপাতত সেটা বলেছে, সেটা সত্যি, ভেবে দেখার মতো। এভাবে সহজেই কাবু করা যাবে রানি ভবশঙ্করীকে। বেইমান হলেও চতুর্ভুজ যে বুদ্ধিমান সেটা স্বীকার করতেই হবে। নিজের স্বার্থেই তার দেখানো পথেই এগোতে হবে।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আর দেরি করে না ওসমান খাঁ। বিশ্বস্ত বেশ কিছু সৈনিককে বেছে নেয় সে। ছদ্মবেশে তারা থাকবে তাঁর সঙ্গে। আর একজন সেনা আসবে পেছন পেছন। দরকার পড়লে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে তারাও।



ওসমান খাঁ এইভাবে সব ব্যবস্থা পাকা করে দ্রুতগামী অশ্বে চতুর্ভুজের কাছে পাঠায় এক বার্তাবাহককে। জানিয়ে দেয়, কথা মতো কাজ না করলে অথবা কোনোরকম বেইমানির চেষ্টা করলে কিন্তু মৃত্যুই হবে একমাত্র শাস্তি।

॥ সাত ॥

হরিদেব ভট্টাচার্য। অতি প্রাজ্ঞ মানুষ। মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান। শাস্ত্রজ্ঞ এবং আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করলেও বাস্তব জগৎ সম্পর্কে উদাসীন নন তিনি মোটেই। ভূরশুটের এই রায়-মুখোটি রাজবংশ সম্পর্কে রয়েছে তাঁর একটা বিশেষ টান। তাই রানিকে শিবালয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েও রাজধানীতে মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রতিটি কাজের ওপর রাখেন তীক্ষ্ণ নজর।

এব্যাপারে তাঁর একটা সুবিধা আছে। রাজগুরু হিসেবে রাজ্যের সকলেরই প্রণয়্য তিনি। নিজের চরিত্রগুণেই তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। প্রজারা জানে, স্বার্থশূন্য মানুষটি রাজার প্রকৃত হিতৈষী। তাই সকলেই বিনা প্রশ্নে মেনে নেয় তাঁর প্রতিটি নির্দেশ। প্রজাদের এই বিশ্বাসের কারণেই, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন তিনি সব খবর। প্রয়োজনে

তাদের কাউকে কাউকে চর হিসেবেও কাজে লাগান। তাঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতেই তিনি নিয়ে থাকেন উপযুক্ত ব্যবস্থা। সেটা বহুদিন আগে থেকেই। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না তার।

রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর থেকেই সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীর বেশ কিছু আচরণ বিসদৃশ্য লাগছে তাঁর। একটা সন্দেহ ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। অথচ হাতে এমন কোনো প্রমাণ নেই যার ভিত্তিতে কোনো অভিযোগ করা যায়। তাই অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

অপেক্ষা মানে সব কিছুই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া—এই নীতিতে বিশ্বাসী নন তিনি। আর তাই নজর তাঁর খোলা থাকে সবসময়। রাজ্যের সীমান্তে ও অভ্যন্তরের ব্যতিক্রমী বেশ কিছু ঘটনা ঘটতে থাকায় রাজগুরু অত্যন্ত সতর্কভাবে সব কিছু পর্যালোচনা করে মন্ত্রী ও সেনাপতির অগোচরে নিতে থাকেন বেশ কিছু ব্যবস্থা।

বিভিন্ন দুর্গের অধ্যক্ষদের তিনি অজানা এক বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকতে বলেন। সেই সঙ্গে রানি যেখানে রয়েছেন তার চারিদিকের নিরাপত্তা রক্ষায় বেশ কিছু বিশ্বস্ত সুশিক্ষিত অস্ত্রধারীকে নিয়োগ করেন তিনি।

এইসব ব্যবস্থা নেওয়ার পর রানি ভবশঙ্করীকেও সাবধান

করে দেন। বলেন অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে।

চতুর্ভুজ কিন্তু এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেন না। আসলে ভবিষ্যতের অলীক কল্পনায় তিনি তখন এক স্বপ্নলোকের অধিবাসী। তাই না জানলেন নিজে, না জানাতে পারলেন ওসমান খাঁকে।

রানি যে মন্দিরে রয়েছেন তার আশপাশে যে সশস্ত্র রক্ষীরা লুকিয়ে আছে একথা না-জেনেই ওসমান খাঁ অল্প কিছু সেনা নিয়ে হানা দেয় মন্দিরে। কিন্তু মন্দির চত্বরে প্রবেশের আগেই প্রতিরোধের মুখোমুখি হন। রানির নারী বাহিনীর হাতে পাঠানরা যখন পর্যুদস্ত হচ্ছে, সে সময় ভবশঙ্করী ব্যস্ত ছিলেন শিব পূজায়। বাইরে গোলমালের আওয়াজ পেয়েই রণরঙ্গিনী বেশে মন্দিরের বাইরে আসেন তিনি।

ওসমান খাঁ আক্রমণ করবে কী, রানির এই রূপ দেখে কামনার আগুনে জ্বলতে থাকে। কীভাবে রানিকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাবে এই ভাবনাতেই ডুবে থাকে সে।

ওদিকে নারীবাহিনীর অস্ত্রের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হতে থাকে ওসমান খাঁর সঙ্গী পাঠানের দল। প্রাণ বাঁচাতে পিছু হটে অনেকেই। কিন্তু রানির সুরক্ষায় রাজগুরু হরিদেবের নির্দেশ মতো বিভিন্ন দুর্গ থেকে আসা সৈন্যরা সেই পলায়নরত পাঠানদের একবারে কচুকাটা করতে থাকে।

তাই-বা কেন, ওসমান খাঁর পৃষ্ঠরক্ষায় যেসব সৈন্য এসেছিল তারাও বনের মধ্যে নিহত হতে থাকে রানির সেনাদের হাতে। সব মিলিয়ে সেই মন্দির এবং তার আশপাশের বনভূমি হঠাৎ-ই হতাহতের আর্ত চিৎকার আর রানির সেনাদের বিজয় উল্লাসে মুখরিত হয়ে ওঠে।

সেই চিৎকারেই সচকিত হয় পাঠান সর্দার ওসমান খাঁ। বুঝতে পারে ওই আর্তচিৎকার তাঁরই পরাজিত ও আহত সেনাদের। বুঝতে পারে গোপনে হানা দিলেও সেই গোপন কথাটি গোপন থাকেনি রানির কাছে। তাই পালটা আক্রমণে ছিন্নভিন্ন তাঁর বাহিনী। আরও বুঝতে পারে, এই মুহূর্তে না পালালে তাকেও প্রাণ দিতে হবে এখানে। আর সেটা হলে ভূরশুট বা বঙ্গবিজয় আর কখনই সম্ভব হবে না। বঙ্গে আবারও পাঠান অধিপত্যের সূর্যোদয়ও হয়ে যাবে কেবলই কল্পনার বিরিয়ানি।

এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে বীরপুঙ্গব ওসমান খাঁ দ্রুত ঘন বনানীর মধ্যে মিলিয়ে যায়। যাওয়ার আগে অশ্বফুটে বলে, আসবো আবার আসবো। রানিকে আমার চাই—চাই-ই—তা যেমন করেই হোক।

অবস্থা একটু শান্ত হতে বিভিন্ন দুর্গের সেনানায়করা অভিযান জানান রানি ভবশঙ্করীকে। এতজন সেনানায়ককে দেখে একটু বিস্মিত হন রানি ভবশঙ্করী। জিজ্ঞেস করেন,

আপনারা এখানে এলেন কী করে? কে আপনাদের আসার নির্দেশ দিল?

রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য। তিনি আগাম এক বিপদের আশঙ্কা করে আমাদের দ্রুত এখানে আসার নির্দেশ দেন। এবং সেনাপতির কোনো অনুমতি ছাড়াই এখানে এসে দেখলাম এই পাঠান বাহিনীকে। ওই বাহিনীকে আমরা পুরোপুরি নিকেশ করেছি।

ভবশঙ্করী সবই বুঝতে পারেন। এই যে রাজধানী থেকে দূরে বাস করছেন, এটা যে প্রজাদের জন্য কতটা বিপদের কারণ হতে পারে, একথা ভেবে তাঁর মধ্যে এক ধরনের ফ্রোথ যেন টগবগিয়ে ওঠে। বুঝতে পারেন, রাজ্য শাসনের ব্যাপারে কারও ওপর চোখ বুজে বিশ্বাস করতে নেই। তাতে যেমন নিজের নয়, রাজ্য ও প্রজারও সর্বনাশ হয়।

পতিশোক নিরসনে তিনি চলে এসেছিলেন এই নির্জন আবাসে। সে শোক তাঁর দূর হলো ভীষণ এক প্রতিজ্ঞায়। যে স্বামীকে তিনি এত ভালোবাসেন, যে না-থাকায় তিনি বেছে নিয়েছিলেন সেই স্নেহা-অবসর বা নির্বাসন, তাতে তো সবার আগে ধ্বংস হতে যাচ্ছিল স্বামীরই সব কীর্তি। এতো ভালোবাসার নামে স্বামীকেই অবজ্ঞা করা। এ তো অন্যায়, অপরাধ। না, আর নয়। এবার তিনি রাজধানীতেই ফিরে যাবেন। নিজের হাতে তুলে নেবেন শাসনদণ্ড। নেবেন স্বামীকুলের সম্মান ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য। নেবেন নাবালক পুত্রের অধিকারকে সুরক্ষিত করতে। তাকে যোগ্যভাবে গড়ে ভবিষ্যৎকে সুন্দর করতে।

॥ আট ॥

শিবার্চনা শেষে রানি রানি ভবশঙ্করী রওনা হলেন রাজধানীর পথে। প্রথমেই অবশ্য তিনি গেলেন রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্যের বাড়ি। গেলেন কেবল গুরুপ্রণাম করতে নয়, গেলেন চরম সংকটের মুহূর্তে যেভাবে তিনি সবকিছু প্রতিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে দুরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে।

হরিদেব অবশ্য নির্বিকার। তিনি বললেন, রাজার গুরু ও হিতৈষী হিসেবে যা করা উচিত তাই করা হয়েছে। সেই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কথা। বললেন, রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সেনাবাহিনীকে অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে সব দিক থেকে। রাজা নিশ্চিতভাবেই বাইরের শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ব্যবস্থা নেবেন। তবে কেবল বাইরের শত্রু নয়, তাঁকে ঘরের শত্রু সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে মন্ত্রী, পদস্থ রাজকর্মচারী, নিজের পরিজন এবং সেনা-প্রধানদের সম্পর্কে তাঁকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। ঘরের শত্রুরাই

যে মারাত্মক একথাটা মনে রাখতে হবে সবসময়। সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় তাদের ওপর। কোনোসময়ই তাদের অবাধ ক্ষমতা দেওয়া উচিত নয়। সেটা হবে ঘরে সাপ পুষে রাখার মতো ভয়ানক শখ। তাই এবার রাজ্যশাসনে বিশেষভাবে মন দাও। সেইসঙ্গে যে কথাগুলি বললাম সেটা সবসময় মনে রাখবে। মন্ত্রের মতোই জপ করবে তা। যাও এগিয়ে যাও —ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। জয় হোক তোমার সবসময়।

রাজগুরুকে প্রণাম করে রানি ভবশঙ্করী রাজধানী ভবানীপুরের পথে চলেন। যাওয়ার সময় বারবার ভাবতে থাকেন পাঠানদের এই অতর্কিত হামলা আর গুরুদেবের সতর্কবাণীর কথা।

বারবারই রানির মনে হয়, কেন পাঠানরা মন্দিরে তাঁকে আক্রমণ করতে গেল। এটা কি তাদের হঠকারিতা নাকি এ এক গভীর চক্রান্ত? আর সেই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন ঘরেরই কেউ। যদি তাই হয়, তাহলে কে বা কারা এই ঘরশত্রু? গুরুদেব তো স্পষ্টই আঙুল তুলেছেন মন্ত্রী আর সেনাপতির দিকে।

রানির ভাবনা, সত্যিই ওই দু'জনই দায়ী। যদি হন তাহলে তিনি কি দু'জনের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেবেন? নাকি দু'জনের মধ্যে যিনি কম ক্ষতিকারক বা দুর্বল তাঁকে ছেড়ে রেখে অন্যজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। আর তাতেই তো ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেওয়ার কাজটা হয়ে যাবে। এই বিভেদনীতি নিলে দুর্বল হবে চক্রান্তকারীরা। তখন সহজেই দমন করা যাবে দু'জনকেই।

এইসব ভাবনায় ভবশঙ্করী দোলাচল। সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তী অবশ্যই সবচেয়ে মারাত্মক। তাঁর বিরুদ্ধেই আগে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিন্তু তিনি যে চক্রান্ত করেছেন তার কোনো প্রমাণ তো তাঁর কাছে নেই। সেনাবাহিনী তো এখনও তাঁরই হাতে রয়েছে। এ অবস্থায় সেনাপতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিলে সেনা-বিদ্রোহ হবে না তো? এটাই ভাবাচ্ছে ভবশঙ্করীকে।

গড় ভবানীপুরে ফিরে এলেন রানি। এসেই কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নিলেন না। এমনকী এব্যাপারে সেনাপতি চতুর্ভুজকে যে সন্দেহ করছেন সেটাও প্রকাশ করলেন না কোনোভাবে। বরং রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে নিতে থাকে বেশ কিছু ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে জোর দেন সেনাবাহিনীকে আরও জোরদার করার দিকে। এক্ষেত্রে প্রথমেই নিলেন বাহিনীর বহর বাড়ানোর উদ্যোগ। পদাতিক থেকে শুরু করে সব বাহিনী পুনর্গঠন করতে থাকেন। শুরু হয় নতুন নিয়োগ। এবং সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিলেন রানি ভবশঙ্করী নিজে।

কেবল নতুন সেনা নিয়োগ নয়, তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন নিজেই। ফলে বাহিনীর বিশেষ

করে নতুন সেনানীদের সঙ্গে গড়ে উঠল রানির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাঁর প্রতি আনুগত্যও আরও ঘন হতে থাকল। কেবল নতুন নয়, পুরনো সেনাদেরও নিয়মিত তালিম, তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে তার প্রতিকারে সচেষ্ট হয়ে রানি ভবশঙ্করী সর্বার্থেই হয়ে উঠলেন সর্বাধিনায়িকা।

সেনাবাহিনীতে নিজের কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার পরই ভবশঙ্করী সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করলেন। এক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তুললেন না। বরং নিঃশব্দেই সেনাপতির ক্ষমতার ডানা ছাঁটতে থাকলেন।

প্রথমেই চতুর্ভুজকে গড় ভবানীপুর দুর্গ থেকে সরিয়ে দিলেন। তাঁর জায়গায় রাজধানীর দুর্গে সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করলেন রাজবংশেরই সম্ভ্রান্ত বীর রণকুশল ভূপতিকৃষ্ণ রায়কে। পেঁড়ো দুর্গ থেকে তাঁকে নিয়ে এলেন রাজধানীতে।

আরও একটি কাজ করলেন রানি ভবশঙ্করী। অবশ্যই রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্যের নির্দেশ মতোই। অবশ্য কাজটা শুরু করেছিলেন রাজগুরু বহু আগে থেকেই। সমাজের এক অবহেলিত অংশকে সংগঠিত করেন তিনি। অঞ্চলের চণ্ডাল ও বাগদিরা স্বভাব-শক্তির অধিকারী। প্রত্যেকেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। অত্যন্ত পরিশ্রমী। দেশীয় যুদ্ধরীতিতেও অতি দক্ষ। কিন্তু অন্ত্যজকূলে জন্ম বলে তারা বাস করে জনপদের বাইরে। সামাজিক দিক থেকেও উপেক্ষিত তারা। সেই উপেক্ষিতের মাঝখানে দাঁড়ান হরিদেব। তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসায় মুগ্ধ ওই চণ্ডাল ও বাগদিরা তাঁকে বরণ করেছিলেন বড়ঠাকুর হিসেবে।

সেই বড়ঠাকুর হরিদেবের নির্দেশেই রানি ভবশঙ্করী এই চণ্ডাল ও বাগদিদের দিলেন উপযুক্ত মর্যাদা। নিয়মিত বাহিনীর বাইরে তাদের নিয়ে গঠন করলেন এক অতিরিক্ত বাহিনী। সেইসঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যও নিলেন বেশ কিছু ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে রানি হলেন তাদের মা। এই মায়ের জন্য জীবনের সর্বস্ব ত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো তারা। রানিও মাতৃভাবেই তাদের সবদিক থেকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। আর এইভাবে চণ্ডাল ও বাগদিদের এই অতিরিক্ত বাহিনীও হয়ে উঠল রানি ভবশঙ্করীর শক্তির অন্যতম উৎস। আর এসবই হল সেনাপতি চতুর্ভুজকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে।

এইভাবে রাজগুরুর পরামর্শ মতো নিজেকে সবদিক থেকে সুরক্ষিত করেও চতুর্ভুজের বিরুদ্ধে কিন্তু সরাসরি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলেন না ভবশঙ্করী। কৌশলগত কারণেই। কিন্তু দেওয়ান তথা মন্ত্রী দুর্লভ দত্তকে রেয়াত করলেন না। চতুর্ভুজের সঙ্গে দুর্লভ সত্তর যোগসাজস আছে কিনা সে সম্পর্কে রানি তখনও নিশ্চিত নন। কিন্তু তিনি যে রানির উদাসীনতা ও অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজের আর্থিক অবস্থা

বদলে ফেলেছেন সে সম্পর্কে হলেন নিঃসন্দেহ। আর তাই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করলেন না।

দুর্লভ দত্তকে ডেকে রানি ভবশঙ্করী বেশ কড়া সুরেই বলেন, সেরেস্তার খাতাপত্র দেখে বুঝতে পারছি তাতে গরমিল রয়েছে প্রচুর। আর সব কিছুর জন্যই দায়ী আপনি। রাজকোষকে বঞ্চিত করে আপনি নিজের কোষাগারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এটা শুধু অন্যায় নয়, গুরুতর অপরাধ।

দুর্লভ দত্ত কুচক্ৰী, লোভীও, কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন। তাছাড়া চতুর্ভূজের মতো সিংহাসনের প্রতিও তাঁর কোনো লোভ নেই। তাই রানি ভবশঙ্করীর ভর্ৎসনার মুখে তিনি ভেঙে ফেললেন। সব কিছু স্বীকার করে নিয়েই দুর্লভ দত্ত বলেন, যার করেছি সেটা সাময়িক লোভের বশে। তারসঙ্গে আর কোনো অভিসন্ধি ছিল না। সব কিছুর জন্য ক্ষমা চাইছি। আপনি তো মা, দয়া করে আমার পদটা কেড়ে নেবেন না।

রানি বলেন, বেশ, আপাতত পদেই থাকুন। কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ এদিক ওদিক করেছেন তার সবটা রাজকোষে জমা করুন অবিলম্বে। অন্যথায় শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে।

দুর্লভ দত্ত তাতেই রাজি হয়ে নিজের মান খোয়ানো থেকে রেহাই পেলেন।

॥ নয় ॥

অপদস্থ হয়ে চতুর্ভূজ বিষদাঁত ভাঙা সাপের মতোই ফুঁসতে থাকেন। দুর্লভ দত্তর অবস্থা দেখে বুঝতে পারেন তিনি। তাঁকেও সহজে রেহাই দেবেন না রানি ভবশঙ্করী। তবে তিনি যা করেছেন তার কোনো প্রমাণ নেই। দুর্লভ দত্তর সঙ্গে তার একটা আঁতাত ছিল সত্যি—কিন্তু সেটা কেবল আর্থিক লেন-দেন নিয়ে। পাঠানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিন্দুবিসর্গও জানেন না দুর্লভ। তাই তাঁর ওদিক থেকে বিপদ আসার ভয় নেই বললেই হয়।

কিন্তু রানি কেবল রণকুশলী নন, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। রানির কাছে শেষ পর্যন্ত তাঁর পাঠান যোগের ব্যাপারটা যে গোপন থাকবে না—তা তিনি নিশ্চিত। এখন কী করবেন, সেটা সেই মুহূর্তে বুঝতে পারেন না তিনি। রাজধানী থেকে দূরে বসে তাই তিনি কেবল ছটফট করতে থাকেন। হারানো পদ কেবল নয়, পুরো রাজ্যটাকেই কীভাবে পাওয়া যায়, তার ছক কষতে কষতেই কাটে তাঁর দিন।

একবার ভাবেন, যা পেয়েছেন তা অবশ্যই আশার অতিরিক্ত। এতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর কোনো ষড়যন্ত্র না করাই ভালো।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এই রাজ্যের জন্য কম রক্ত তো ঝরাননি তিনি। এতদিন ধরে সাজিয়েছেন দাবার ঘুঁটি। এ

অবস্থায় সব ছেড়ে দেবেন? পর মুহূর্তেই প্রশ্ন, ছেড়ে না দিয়ে করবেন কী? পাঠান-অধিপতি ওসমান খাঁ আপাতত ওড়িশাতে শক্তিসংগ্রহ করছেন। তাঁর সঙ্গে কি এবার তিনিই যোগাযোগ করবেন। কিন্তু যদি সব কিছু ঠিকমতো না হয়। যদি ধরা পড়ে যান—তাহলে?

এই তাহলেটাই এখন তাঁর ভাবনার পথে সবচেয়ে বড়ো কাঁটা। সেই কাঁটাই অনবরত রক্তক্ষরণ ঘটছে তাঁর হৃদয়ে। আর তাতেই নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হয় চতুর্ভূজের।

ওদিকে ওড়িশায় ওসমান খাঁরও তখন একই অবস্থা। বঙ্গ বিজয় তাকে করতেই হবে। মুঘলদের কাছ থেকে আবার ছিনিয়ে নিতে হবে বঙ্গের অধিকার। আর তার জন্যই ভুরশুট রাজ্যকে নিতে হবে সঙ্গে। তাঁর প্রস্তাবে যদি ভুরশুট রাজি হতো তাহলে কোনো সমস্যাই ছিল না। কিন্তু অদূর অতীতে রুদ্রনারায়ণ কিছুতেই রাজি হননি তাদের কথায়। রানি ভবশঙ্করীও যে তাঁর কথা শুনবেন না, তা নিশ্চিত। তাই যুদ্ধ করেই জয় করতে হবে ভুরশুট। কিন্তু এক্ষেত্রে যে রক্তক্ষয় হবে তাতে বঙ্গদেশ নিয়ে মুঘলদের সঙ্গে লড়াইটা হয়ে যাবে আরও কঠিন। তাই কৌশলের পথ নেওয়ার কথাই ভাবে সে।

অবশ্য কেবল এটাই নয়, ওসমান প্রতি মুহূর্তে দক্ষ হচ্ছে কামনার আগুনে। রানি ভবশঙ্করীর রূপ দেখার পর থেকেই তাঁকে অন্ধশায়িনীর করার উদগ্র কামশরে বিদ্ধ হচ্ছে সে অহরহ। বঙ্গজয়ের চেয়েও রানি ভবশঙ্করীকে নিজের হারেমে আনার বাসনাটাই বড়ো তীব্র এখন ওসমান খাঁর কাছে। তাই সে কেবল ভাবছে।

ভাবছে, ভুরশুটের সেনাপতি চতুর্ভূজ সেবার ব্যর্থ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এখনো ভুরশুটের সেনাবাহিনীর একটা বড়ো অংশই রয়েছে তাঁর অধীনে। তাঁকে দলে টানতে পারলে ভবশঙ্করীকে লাভ করাটা অনেকটাই সহজ হবে। আর সেই চেষ্টায় এবার চতুর্ভূজের কাছে পাঠায় নতুন এক চর—সঙ্গে পাঠায় নানা মণিরত্ন, স্বর্ণলংকার ভরা নজরানার ডালি।

চতুর্ভূজ স্বভাবলোভী। তাই ওই রত্নরাজি যে তাঁকে প্রলোভিত করবে একথা জানতো ওসমান খাঁ। তাই প্রথমেই নিজের স্বার্থের কথা না বলে চতুর্ভূজকে প্রলোভনের নাগপাশে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধার নির্দেশ দিয়েছিল সে দূতকে। অত্যন্ত ধূর্ত দূতও সেই কাজটিই করল। প্রথমেই ওসমান খাঁর প্রীতির নিদর্শন হিসেবে একপেটি মণিমুক্তা ও নানা রত্নসহ বিপুল পরিমাণ সোনার ভরা ডালাটি এগিয়ে দিল। চতুর্ভূজও প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ডালাটি নিজের দিকে টেনে নেন। তাঁর এই ব্যগ্রতাই বলে দেয় ওসমান খাঁর টোপ গিলেছে চতুর্ভূজ।

এরপর বঁড়িশি গাঁথা মাছকে খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তোলায় মতোই বাক্যজালে চতুর্ভূজকে জড়িয়ে ফেলতে উদ্যোগী হলো ওই ব্রাহ্মণ। ধীরে ধীরে আসে আসল কথায়।

বলে, এ তো সামান্য, ওসমান খাঁ আরও ধনরত্ন দিতে চেয়েছেন আপনাকে। কথা দিয়েছেন রানি ভবশঙ্করীকে তাঁর হাতে তুলে দিলে তিনি দেবেন আরও-আরও বহু ধনরত্ন। তাই-বা কেন, ও আপনাকেই তো বসাবেন তিনি ভুরশুটের সিংহাসনে। এখন আপনি বলুন, এব্যাপারে ওসমান খাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে চান কিনা? রাজি না হলে বলুন। আমিও বিদায় নিই তাহলে।

ব্যগ্র কণ্ঠে বলে ওঠেন চতুর্ভুজ, না-না তা যাবেন কেন। আমি তো না বলিনি। তবে ওসমান খাঁকে যত বড়ো বীর বলে জানতাম, কাট শাঁকড়ার ওই যুদ্ধে তাঁর ওই পালিয়ে যাওয়া দেখে আমার সব বিশ্বাসই চলে গেছে।

দূত বলে, ওসমান খাঁ ওই যুদ্ধের ফলাফলের জন্য নিজেও লজ্জিত। কিন্তু এবার আর সেটা হবে না। এবার তিনি সব দিকে আটঘাট বেঁধেই আসবেন। এখন দেখুন আপনি কী করবেন?

কিছুটা নিরাসক্ত ভাবেই কথাগুলি বলে দূত। ওসমান খাঁ এবার চতুর্ভুজকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না এমনই একটা ভাব দূতের কথায়।

দূতের ভাব দেখে চতুর্ভুজ চঞ্চল। তবে কি তাঁর সাহায্য ছাড়াই আক্রমণ করবে ওসমান? সেটা হলে তো ফাঁকে পড়বেন তিনিই। তাহলে—

চতুর্ভুজের এই দোণামনার অর্থটা বুঝতে দেরি হল না দূতের। তবে হঠাৎ মনে পড়েছে এমন একটা ভান করে দূত বলে, ও হ্যাঁ, ওসমান খাঁ আপনার জন্য এটাও উপহার হিসেবে

পাঠিয়েছেন।

উপহারের নামে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন চতুর্ভুজ। কিন্তু পেটিটা খুলেই আঁতকে বলেন, এ তো ছুরি।

—হ্যাঁ। তিনি বলেছেন, ভুরশুট তিনি আক্রমণ করবেনই। রানিকে তাঁর চাই-ই। দরবারে আপনার সাহায্য ছাড়াই।

চতুর্ভুজ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলেন, আমি সাহায্য করব না, তাতো বলিনি। তবে রানিকে ধরা বড় সহজ নয়। তাঁকে ধরতে হলে সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

—তার জন্যই তো আপনার কাছে আসা।

—রানি এখন প্রাসাদ ছেড়ে প্রায়ই চলে যান তারকেশ্বরের কাছে ছাওনাপুর দুর্গে। পাশেই বাশুড়ি গ্রামে রয়েছে ভবানীমন্দির। সেখানেই করেন সাধনা—একাই। সেটাই তাঁকে হরণ করার সবচেয়ে ভালো সময়।

—তা তো বোঝা গেল, কিন্তু আপনার সাহায্যটা পাওয়া যাবে তো।

চতুর্ভুজ বলেন, অবশ্যই পাওয়া যাবে, তবে গোপনে। বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে সামনে আসা সম্ভব নয়। তাই কৌশলে কাজটা সারতে হবে।

কৌতুহলী দূতের প্রশ্ন, কৌশলটা কী?

চতুর্ভুজ বলেন, পাঠান বাহিনী ভুরশুটে এলে আমি তাদের ধরার জন্য ধাওয়া করবো। পাঠানরাও ভয় পাওয়ার ভান করে উত্তর দিকে যাবে। ওরা ছাওনাপুরের কাছাকাছি পৌঁছালে



স্বস্তিকা - পূজা সংখ্যা

রাজধানীকে রক্ষার অজুহাতে আমি সেনাদের নিয়ে ফিরে যাব।
তারপরের কাজটা করতে হবে ওসমান খাঁকেই।

দূত বলে, সবই তো বোঝা গেল। কিন্তু কবে কবে করতে
হবে ওই অভিযান।

সেটা পরে ওসমান খাঁকে জানিয়ে দেবেন চতুর্ভুজ। এমনই
ঠিক হয়।

॥ দশ ॥

দূতের মুখে সব শুনে ভাবে ওসমান, পরিকল্পনাটা মন্দ নয়।
ওই ভাবেই কবজা করবে রানিকে। সিদ্ধান্তে স্থির প্রায় সঙ্গে
সঙ্গে অভিযানের জন্য পাঁচশোরও বেশি সৈনিককে তৈরি
থাকতে বলে। তারপর অপেক্ষা করতে থাকে চতুর্ভুজের বার্তার
জন্য।

কয়েক দিনের মধ্যেই আসে বার্তা। চতুর্ভুজ জানিয়েছেন এই
বৈশাখী অমাবস্যায়া বাঙলি গ্রামের ভবানীমন্দিরে এক বিশেষ
পূজো করবেন রানি ভবশঙ্করী। তাই আগের রাতে পৌঁছতে
হবে মন্দিরে। তিনি এদিকে সেনাদের রাখবেন মন্দির থেকে
অনেক দূরে। এতে কাজটা সহজে সারা যাবে বলে বিশ্বাস।

পরিকল্পনা মতোই ওসমান খাঁ ভুরশুটে পৌঁছে যায় তার
বাছাই বাহিনী নিয়ে। তারপরে রাতের অন্ধকারে চলে আসে
খানাকুলের কাছে এক গভীর বনে। দিন শুরু আগেই বনের
মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় শিবির ফেলে পাঠানরা। দিনটা
ওখানেই কাটাবে তারা।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম নিচ্ছে সকলে। ওসমান
খাঁ পুরো ব্যাপারটা আবারও ভালো করে ছকে নেওয়ার জন্য
ফৌজদারদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। বলে এই অভিযানটা
সফল করতেই হবে। চতুর্ভুজের মতো বিশ্বাসঘাতক আমাদের
সঙ্গে থাকায় কাজটা অনেক সহজ হবে বলেই বিশ্বাস। আশা
করছি, কাক পক্ষিতেও জানে না এই ষড়যন্ত্রের কথা।

ওসমানের আশা কিন্তু সফল হলো না। ঠিক ওই সময় কালু
নামে এক ব্যাধ শিকারের জন্যই হাজির হয় ওই বনে। একসঙ্গে
অত ঘোড়া ও সশস্ত্র লোক দেখে ভয় পায় কালু। সন্দেহও হয়।
তাই সোজা চলে যায় খানাকুলের কোতোয়ালের কাছে। খুলে
বসে সব। শুনে কোতোয়ালও বুঝতে পারেন ভয়ংকর একটা
কিছু ঘটতে চলেছে। সেই আশঙ্কা থেকেই কোতোয়াল সবকিছু
লিখে এক অশ্বারোহীকে পাঠান রাজধানী গড় ভবানীপুরে।
চিঠিটা রানির নামে লেখা। তিনি না থাকলে সেটা সর্বাধিনায়ক
বা দুর্গের উপস্থিত উচ্চপদস্থ কাউকে দিতে নির্দেশ দেয়
কোতোয়াল।

দুর্গে সেসময় রানি ভবশঙ্করীর থাকার কথা নয়। ছিলেনও
না। সর্বাধিনায়কও বিশেষ কাজে অন্যত্র ছিলেন। তাই চিঠিটা

নিলেন চতুর্ভুজ চক্রবর্তীই।

চিঠি পেয়ে চতুর্ভুজ ভাবেন, সর্বনাশ। চিঠির কথা মতো
ব্যবস্থা নিলে তো বিপদে পড়বে ওসমান খাঁ। আর ওসমানের
বিপদ মানে তো তাঁরও বিপদ। তাই কোতোয়ালকে লেখেন,
চিন্তা করার কিছু নেই। হয়তো দস্যু বা ডাকাতরা জড়ো হয়েছে
বনে। কালু ভয় পেয়ে এসব উলটাপালটা বলছে। যাই হোক,
আমি দেখছি পুরো ব্যাপারটা।

চিঠিতে কোতোয়াল কিছু নিশ্চিত হতে পারলেন না। তাঁর
অভিজ্ঞতা বলছে, এটা উপেক্ষা করার মতো কোনো ঘটনা নয়।
আর তাই পেড়ো দুর্গে সর্বাধিনায়ক ভূপতিকৃষ্ণকে পুরো
ব্যাপারটা জানান।

ওদিকে অবস্থা সামাল দিতে চতুর্ভুজও তৎপর হন। তাঁর
সেনাদের নিয়ে সোজা চলে আসেন খানাকুলে। সকলকে
আশ্বাস দিয়ে বলেন, ভয় নেই, আমি এসে গেছি। সকাল হোক,
ওই জঙ্গলে তন্নতন্ন তল্লাশি চালাবো। ধরতে পারলে সব
ক'টাকে কঠিন শাস্তি দেবো।

চতুর্ভুজের কথায় সকলে আশ্বস্ত হয়। কোতোয়ালের
সন্দেহটা যায় না। বরং চতুর্ভুজের কথাবার্তা সবই কেমন
অভিনয় বলে মনে হয়। তাই রাতেই তল্লাশি করার অনুরোধ
জানান। চতুর্ভুজ সেকথায় কান দেন না। আর নিজে গোপনে
খবর পাঠান ওসমান খাঁর কাছে। বলেন দেরি নয়, আজ এখনই
বাঙড়ি গ্রামের মন্দিরে হামলা করুন।

॥ এগারো ॥

কেবল খবর পাঠানো নয়, ওসমানের পাঠান বাহিনীকে ওই
রাতে বাঙড়ির পথ দেখানোর জন্য লোকও পাঠান চতুর্ভুজ।
তাঁর আশ্বাস, ওসমান খাঁ বাঙড়ি অবরোধে এগিয়ে যাওয়ার
ঘণ্টা তিন চারের মধ্যেই তিনিও তাঁর বাহিনী নিয়ে যোগ দেবেন
তাঁর সঙ্গে।

এহেন বার্তায় চতুর্ভুজের ওপর ওসমান খাঁর বিশ্বাস আরও
বেড়ে যায়। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অভিযানের জন্য তৈরি হয়।
চতুর্ভুজের পাঠানো পথ প্রদর্শককে অনুসরণ করে রওনা হয়
সে বাঙড়ির পথে।

গ্রীষ্ম কাল। দামোদর সে সময় থাকে প্রায় জলশূন্য।
পুরণ্ডায় সেই মরা দামোদর পার হয়ে পাঠান বাহিনী এগিয়ে
চলে।

খানাকুলের কোতোয়ালের তৎপরতা এবং তারপর
সর্বাধিনায়ক ভূপতিকৃষ্ণ রায়ের দূরদর্শিতার কারণে বাঙড়ির
ভবানী মন্দির অঞ্চল আর তখন সেনাশূন্য অবস্থায় রইল না।
বরং ভুরশুটের নির্ভীক দেশপ্রেমী সেনা প্রচলনভাবে বাঙড়িকে
প্রায় ঘিরে রইল। বস্তুত পাঠান বাহিনীর প্রতিরোধে রানি

ভবশঙ্করীর বাহিনী তখনও ক্ষুধার্ত বাঘ।

রানির বাহিনী যে এভাবে চারিদিকে সতর্ক ভাবে শত্রুর প্রতীক্ষা করবে এটা ছিল চতুর্ভূজের কল্পনার বাইরে। অথচ এটা তাঁর জানা উচিত ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণেই প্রকৃত অবস্থাটা বোধহয় বিস্মৃত হয়েছিলেন তিনি। চতুর্ভূজের হাত থেকে সেনাবাহিনীর ভার নেওয়ার পরই রানি সব সৈন্যকে রাজধানীতে না রেখে রাজ্যের নানা জায়গার দুর্গে মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তখন থেকে ভুরগুটের বাহিনী আর রাজধানী-কেন্দ্রিক ছিল না। বিপদের সংকেত পেয়ে মুহূর্তে হড়পা বানের মতোই সেখানে আছড়ে পড়ার জন্য তৈরি থাকত সেনারা। রাজ্যের কোনো জায়গাই তার ফলে আর সেভাবে অরক্ষিত ছিল না। এই পরিকল্পনারই সুযোগ পাওয়া গেল বাশুড়িতে।

অমানিশায় পূর্ব ব্যবস্থা মতোই বাশুড়ির ভবানী মন্দিরে শুরু হয়েছিল দেবীর বিশেষ পূজা। সেকালের বিশিষ্ট তান্ত্রিক গোলোক চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই পূজাবাসরে তন্ত্রমতে রানিকে অভিষিক্ত করার ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বেশ ভালোভাবেই।

সে কাজ শেষ হওয়ার প্রায় পরে পরেই রানির হাতে এল সর্বাধিনায়কের বার্তা। পাঠান বাহিনী এগিয়ে আসছে বাশুড়ি আক্রমণে। শত্রুর সঙ্গে যোগ দিয়েছে চতুর্ভূজ চক্রবর্তীর বাহিনীও। বিষয়টা উদ্বেগজনক। তবে রানির বাহিনীও প্রস্তুত। যে কোনো আক্রমণ শুধু প্রতিহত করা না, শত্রুদের নির্মূল করার জন্যও কৃতসংকল্প এখন রাজ্যের বাহিনী। সব ব্যবস্থা নিয়েও সর্বাধিনায়ক কিছু সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেছেন রানিকেও।

দেবীপূজার দিন এমন উৎপাতে রানি ভবশঙ্করী একটু বিচলিত। কিন্তু রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য রানিকে শত্রুনিধনে উজ্জীবিত করে বলেন, চিন্তার কিছু নেই। দেবী ভবানীর কৃপায় ধ্বংস হবে শত্রু।

রানিকে তৈরি থাকতে বলে রাজগুরু চণ্ডাল ও বাগদি বাহিনীর অনিয়মিত সেনাদেরও শত্রুকে বাধা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

।। বার ।।

একই অঙ্গে বহুরূপ দেবী ভবানীর। কখনও আনন্দে নৃত্যপর্যায় সন্তান পালনে। কখনও ভয়ংকরী পাষাণদলনে। বৈশাখের সেই অমানিশায় দেখা গেল দেবীলীলার সেই বিচিত্র রূপ।

সেদিনের বৈশাখী অমাবস্যা রাত্রি তথা ভুরগুটের সৌভাগ্য গগনে বিদ্যমান হলো রাকা পূর্ণিমার স্নিগ্ধ রূপে। একই সঙ্গে ওই দিনটিই চতুর্ভূজ ও পাঠানবাহিনীর কাছে দেখা দিল কাল রাত্রি রূপে। ভীষণা রক্তবদনা দেবী তখন রক্তদস্তিকা—শত্রুর

শোণিত পানে আরক্ত নয়না।

পাঠানদের প্রতিহত করার জন্য একশো গজারোহী, পাঁচশো করে অশ্বরোহী এবং পদাতিক তখন উন্মুক্ত উদ্যত অস্ত্রহস্ত। সে বাহিনীর নেতৃত্বে স্বয়ং রানিও গজাসনা—শূলধারিণী।

পাঠানরা এগিয়ে আসতেই রানির নির্দেশে নিভে গেল সব মশালের আলো। তিনদিক পরিখা ঘেরা এক প্রান্তরে অবরুদ্ধ হলো পাঠান সেনা।

প্রথমটায় তাদের গ্রাস করেছিল এক ধরনের আঁস্তি। রানির বাহিনীকে তারা ভেবেছিল চতুর্ভূজের সেনা। তাই উল্লসিত পাঠান-কণ্ঠে উঠেছিল জয়ধ্বনি।

কিন্তু সে উল্লাস ক্ষণিকের। রানির ইঙ্গিতে মশালগুলি জ্বলতেই পাঠানরা দেখে তারা দাঁড়িয়ে আছে খাদের কিনারায়—মহিষধ্বজ মৃত্যুর দেবতা যমের সামনে। অথবা তারা যেন তখন ভবানী মন্দিরে উৎসর্গীকৃত বলির পশু। রানির সেনার উদ্যত কৃপাণের সামনে বড়ো অসহায় তখন তারা।

রানি ভবশঙ্করীর নেতৃত্বে ভুরগুটের বাহিনী অবরুদ্ধ পাঠানদের তিন দিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করতে থাকে। রানির বাহিনীর সেই প্রতিরোধ অথবা পালটা আক্রমণের মুখে পাঠানরা তখন ঝড়ের মুখে এঁটো পাতার মতোই ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

পাঠান অধিপতি ওসমান খাঁ মরিয়া চেপ্টা চালিয়েও পালটা প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হলো। রানি ভবশঙ্করী তখন দেবী ভয়ংকরী। তাঁর বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে পাঠানরা নিতান্ত অসহায় ভাবে নিহত হতে থাকে। তারা তখন সত্যিই যেন দেবী ভবানীর সামনে প্রদত্ত বলির পশু।

ক্ষুরধার বুদ্ধি, কৌশলগত সুবিধা এবং উচ্চতর রণদক্ষতায় রানির বাহিনী সেদিন পাঠানদের নিদারুণভাবে পর্যুদস্ত করে। সেই যুদ্ধে ওসমান খাঁ নিজেও গুরুতর আহত হয়। যুদ্ধের রূপ ও পরিণতি বুঝে ওসমান খাঁ তখন পালিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলো। তাই তার বাহিনীর অবশিষ্টদের কথা না ভেবে ঘোড়ায় চেপে রাতের অন্ধকারে একাই বনপথ ধরে সে।

সারারাত ঘোড়া ছুটিয়ে এক নিরাপদ জায়গায় পোশাক বদলায় সে। সর্দার বা সেনানীর বেশ ছেড়ে সাজে ফকির। ভিক্ষাই তখন তার বেঁচে থাকার অবলম্বন। ওই অবস্থায় বহু কষ্টে সে ফেরে ওড়িশায়। কেউ কেউ বলেন, ওই যুদ্ধে নিহত হয় ওসমান খাঁও।

বস্তুত বাশুড়ির মাঠের ওই যুদ্ধের ফলে পাঠানদের আবার বঙ্গবিজয়ের স্বপ্ন আলেয়ার মতোই মিলিয়ে যায়। বাশুড়ির মাঠের এই যুদ্ধে রানি ভবশঙ্করী যে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন এক কথায় তার কোনো পূর্বনজির নেই। পাঠান সেনাদের বিরুদ্ধে রানি যেরকম নির্ভীকভাবে রুখে দাঁড়ান এবং যে রণনৈতিক দক্ষতায় যুদ্ধ পরিচালনা করে ওসমান খাঁর বাহিনীকে

পরাজিত করেন তাতে প্রজাদের কাছে তিনি দেবীরূপে উন্নীত হন। তাই-বা কেন, বাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের প্রায় দুই শতক আগে বঙ্গের রানি যে বীরত্বের পরিচয় দেন তা তাঁকে বিশ্বের যে কোনো দেশের বীরাসনার তালিকায় প্রথম সারিতে এক গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করে।

এই যুদ্ধের সময়ই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীকে কৌশলে আটক করেন সর্বাধিনায়ক। রানি ভবশঙ্করী রাজধানীতে ফিরে কার্যত এক গণআদালতে চতুর্ভুজের সমস্ত কুকীর্তির কথা প্রকাশ করে জনতাকেই চতুর্ভুজের শাস্তিবিধান করতে বলেন। সমবেত জনতা চতুর্ভুজের প্রাণদণ্ড চাইলেও রানি তাকে আজীবন কারারুদ্ধ রাখার এবং নিয়মিত বেত্রাঘাতের মতো শাস্তির কথা ঘোষণা করেন। চতুর্ভুজের এই শাস্তির মধ্য দিয়ে ভুরগুটে এক বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীর জীবনের সমাপ্তি ঘটে। বঙ্গে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়ের।

।। তের ।।

বঙ্গজীবনে সত্যিই শুরু হলো এক নতুন যুগের। গড়ভবানীপুরে দুর্গের সামনের বিরাট ময়দানটি সেদিন সব অর্থেই পরিণত এক লোকারণ্যে। তরঙ্গ মুখরিত মহাসাগরের মতোই সেই লোকসাগর থেকে শোনা যাচ্ছিল এক বিরামহীন গর্জন। জয় ধর্মের জয় / জয় সত্যের জয় / জয় দেশমাতার জয় / জয় রাজলক্ষ্মী ভবশঙ্করীর জয়।

বঙ্গের সীমা ছাড়িয়ে সে জয়ধ্বনি এক সময় পৌঁছলো দিল্লিতেও। রানির ওই পাঠান বিজয়ের কথা শুনলেন মুঘল বাদশা আকবর। আকবর বিস্মিত হলেন সব শুনে। এক সময় মনে হচ্ছিল তাঁর, এও কী সম্ভব! তার মুঘল বাহিনী এখনও বঙ্গদেশ থেকে নির্মূল করতে পারেনি যে পাঠান শক্তিকে তাকে কিনা এক বাঙ্গালি—তাও এক নারী! এ কি বিশ্বাযোগ্য?

এই জিজ্ঞাসার মুখেই বাদশা আকবর বঙ্গদেশে মুঘল প্রতিনিধিকে দ্রুত প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহ করে তাঁকে জানাতে নির্দেশ দিলেন।

অচিরেই এল বার্তা। সব সত্য। সত্যিই বীরাসনা ভবশঙ্করী—ভুরগুট রাজ্যের মহারানি অপূর্ব রণকুশলতায় পরাজিত করেছেন পাঠান বাহিনীকে। বলতে কী, বঙ্গদেশে পাঠান শক্তি এখন এতটাই দুর্বল যে সে দেশ পাঠানশূন্য বললেও অতুক্তি হবে না।

সব শুনলেন বাদশা আকবর। ভুরগুট রাজ রুদ্রনারায়ণ মুঘলদের মিত্রই ছিলেন। প্রকৃত সুহৃদদের মতোই বঙ্গদেশে পাঠানদের বিরুদ্ধে মুঘল রাজশক্তির অভিযানকে সাহায্য করেছেন তিনি সবরকম ভাবে। তাঁর বীরত্ব, রণকুশলতা ও আনুগত্যের পরিচয় তিনি পেয়েছেন বহুবার—বহুভাবে। কিন্তু

তাঁর অর্ধাঙ্গিনীও যে একইরকম শক্তির অধিকারিণী তা জানা ছিল না তাঁর। এই অজ্ঞতার জন্য বাদশা নিজেকেই দায়ী করেন। সেইসঙ্গে ওই বীর রমণীকে যোগ্য সম্মান জানিয়ে, ভুরগুটের স্বাধীনতা অব্যাহত রেখে তাদের আনুগত্য যাতে একইভাবে রয়ে যায় তা সুনিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথার প্রায় বাইরে গিয়েই তিনি অম্বর অধিপতি মানসিংহকে পাঠালেন বঙ্গদেশে বাদশাহের সনদ এবং বাদশাহী নজরানা দিয়ে।

মানসিংহ আসছেন, এই সংবাদে প্রথমটায় রানি ভবশঙ্করী অথবা মহাপাত্র সর্বাধিনায়ক ভূপতিকৃষ্ণ এবং রাজসভার অন্যান্যরা আহ্লাদিত হতে পারেননি। বরং দেখা দিয়েছিল এক ধরনের শঙ্কা। রাজ্য দখলে মুঘল বাদশার এ কোনো নতুন কৌশল নয় তো!

এই ভাবনা থেকেই প্রথমটায় বাদশাহের প্রতিনিধি রাজা মানসিংহকে স্বাগত জানাতে নয়, রাজ্যকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সেনাদলকে তৈরি থাকতে নির্দেশ দেন রানি। কিন্তু তাঁকে আশ্বস্ত করেন রাজগুরু। বলেন, ‘সেরকম বিপদের আশঙ্কা করছি না আমি। বাদশাহ সত্যিই খুশি হয়েছেন রানির রণকুশলতায়। তাই দুশ্চিন্তা নয়। রাজা মানসিংহর যোগ্য সংবর্ধনার আয়োজন করো। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য নাও উপযুক্ত ব্যবস্থা।’

রাজগুরুর অভয়বাক্যেই সেজে উঠল রাজধানী। রাজা মানসিংহর আসার পথে তৈরি হলো নানা সুদৃশ্য তোরণ। আমন্ত্রিত হলেন বঙ্গদেশের বিভিন্ন রাজা, নায়ক ও বিশিষ্টজন। রাজধানী হয়ে উঠল যেন দেবরাজের নন্দনকানন।

গড়ভবানীপুর দুর্গ সংলগ্ন বিস্তৃত চত্বরে সুদৃশ্য চন্দ্রাতপের নীচে সুসজ্জিত সভা মণ্ডপে বিষ্ণুপুর রাজ, বলাগড়রাজ, বর্ধমান রাজ, বাহিরগড়ের ক্ষত্রিয় রাজ ইত্যাদি বিশিষ্টদের জন্য রাখা হলো বিশেষ ব্যবস্থা। সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট জন এবং আপামর প্রজাসাধারণের জন্যও রাখা হলো উপযুক্ত আসন।

একদিকে সুপরিকল্পিত নির্মিত সুদৃশ্য মঞ্চে রাজা মানসিংহের জন্য রাখা এক সিংহাসন। সিংহাসনের একদিকে রাখা হলো রাজগুরুর জন্য বিশেষ আসন। অন্যদিকে রানি এবং রাজপুত্র প্রতাপনারায়ণের বসার জন্যও রাখা হলো উপযুক্ত সিংহাসন।

নির্দিষ্ট দিনে রাজা মানসিংহ ভুরগুট রাজ্যে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল নানা মঙ্গলবাদ্য। পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়ে শ্বেত অশ্বে সমাসীন মানসিংহ প্রবেশ করলেন মণ্ডপে। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে ব্রাহ্মণদের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে বেদমন্ত্র। সব মিলিয়ে সে এক অপার্থিব পরিবেশ। যেভাবে রাজা মানসিংহকে স্বাগত সংবর্ধনা জানানো হয় তাতে অভিভূত তিনি।

প্রাথমিক পর্বের পর উঠে দাঁড়ালেন রাজা মানসিংহ। বললেন, আজ তিনি এখানে এসেছেন বাদশাহের প্রতিনিধি হিসেবে। রাজ্যবাসী তাঁকে যেভাবে সম্মান জানালো সেটা



প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ আকবরের প্রতিই নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলি। এর মধ্য দিয়ে ভুরশুট ও দিল্লির মধ্যে সম্পর্কটা আরও সুদৃঢ় হলো।

এইরকম ভাষণ প্রতিভাষণের মধ্য দিয়েই রাজা মানসিংহ বলেন, রানি ভবশঙ্করীর বীরত্ব, বিচক্ষণতা ও প্রাজ্ঞতায় মুগ্ধ বাদশাহ তাঁর জন্য মণিमुক্তামণ্ডিত এই উপহার পাঠিয়েছেন। বাদশাহি সনদে তিনি রানি ভবশঙ্করীকে ‘মহারানি রায়বাঘিনী’ উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

রাজা মানসিংহের হাত থেকে বাদশাহি ওই সনদটি নিয়ে রানি বলেন, ‘শাহেনশাহকে আমার শত সহস্রকোটি প্রণাম। তাঁর দেওয়া এই সম্মানই আজ থেকে হবে আমার পরিচয়। মহারানি ভবশঙ্করী আজ থেকে তাঁর নামের সঙ্গে নবগৌরবের ‘রায়বাঘিনী’ উপাধিই বহন করবেন।’

রাজগুরু হরিদেবও উৎফুল্ল বদনে বলে উঠেন—‘এই রায়বাঘিনী নামেই তুমি হবে চির প্রসিদ্ধা’। তোমার এই সম্মান প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ হৃদয়ে বলছি—জয়তু মহারানি ভবশঙ্করী রায়বাঘিনী।’

রাজগুরুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সেই জনসমুদ্রে উঠল গর্জন—‘জয় মহারানি ভবশঙ্করী রায়বাঘিনীর জয়।’

বঙ্গের নারীর এ এক বিরল সম্মান। তাঁর আগে আর কেউ পাননি এমন সম্মান। সেই মুহূর্ত থেকে তিনি হয়ে উঠলেন

বঙ্গের নারীশক্তির প্রতীক—দুর্জয় শক্তির মূর্তপ্রতিমা। বাঘের রাজা সুন্দরবনের বাঘের মতোই তিনিও হলেন—সাহস-শক্তি-বীর্যের এক সম্মিলিত প্রতিমূর্তি। বঙ্গ জননীর ললাটের তিলকরেখা।

॥ চোন্দ ॥

রায়বাঘিনী রানি ভবশঙ্করী এবার সমস্ত দিক থেকে ভুরশুট রাজ্য সংগঠনে মন দিলেন। বীর্যময়ী রানি দেখা দিলেন কল্যাণময়ী রূপে। প্রজাকল্যাণে তিনি রূপায়ণ করতে থাকেন একের পর এক ব্যবস্থা। জলাশয় খনন, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদির ফলে বাড়তে থাকে রাজ্যের উৎপাদন শক্তি। একইসঙ্গে প্রজারাও হয়ে ওঠেন সমৃদ্ধ। ফলে ঘটে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি।

রাজ্যের জন্য নানা উন্নয়নমূলক সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রকল্প নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষার প্রসারেও দিলেন সমান নজর। দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে নতুন নতুন টোল-চতুষ্পাঠী। রাজ্যের পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনরা হতে থাকেন সংবর্ধিত। সব মিলিয়ে ভুরশুট সব অর্থেই হয়ে ওঠে বঙ্গের এক আদর্শ রাজ্য।

রাজ্য গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গড়ে তুলতে থাকেন তাঁর

একমাত্র অবলম্বন রাজ্যর ভাবী অধীশ্বর প্রতাপনারায়ণকেও।
সব দিক থেকেই সুশিক্ষিত করে তিনি দেন পুত্রের বিবাহ।
তারপর উপযুক্ত সময়ে তাকে করেন রাজ সিংহাসনের
অভিষিক্ত।

রায়বাঘিনী রানি ভবশঙ্করী এখন পূর্ণকাম। ঘরে এসেছে
নতুন বংশধর—প্রতাপপুত্র নরনারায়ণ। আর কোনো পার্থিব
আকাঙ্ক্ষা নেই তাঁর। সকলকে সমস্ত দিক থেকে সুরক্ষিত করে

এবার তিনি অবসর নেন সংসার থেকে। হন কাশীবাসিনী।
সেখানেই তাঁর নশ্বর জীবনের হয় অবসান। কিন্তু বঙ্গজীবনে হন
অবিনশ্বর এক সত্তার অনিবার্ণ হোমশিখা।

তথ্যস্বাগ : ৩

- ১। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য : রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিনী
- ২। গৌরচন্দ্র ভট্ট : রাণী ভবশঙ্করী
- ৩। বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

An ISO 9001 : 2008 Certified Company

Alloy Group



UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD.



AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.



RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.

Aluminium & Hardware People



503, Kamalalaya Centre, 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA

Phone : 4050 3400

E-mail : info@alloyindia.com Website : www.alloyindia.com



রেনেসাঁসের বঙ্গে হিন্দুত্বের চেতনা

অর্ণব নাগ

বঙ্গে রেনেসাঁসের কাল হিসাবে মোটামুটি সমগ্র উনিশ শতকই অর্থাৎ ১৮০০ সাল থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত চিহ্নিত হয়ে আছে। এই রেনেসাঁসের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল বাঙ্গালির হিন্দুত্ব বোধের দর্শন। চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শশধর তর্কচূড়ামণি, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র এবং অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ, এমনকী অবাস্তালি হলেও সখারাম গণেশ দেউস্কর, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী— উনিশ শতকের মনীষীরা বাঙ্গালির মধ্যে হিন্দুত্বের চেতনা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা কালক্রমে ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটায়।

ভারতকে ‘মা’ হিসাবে চিত্রায়ন ও দেখার সূত্রপাত ১৮৬০-এর দশকে। ‘ভারতমাতা’ শব্দের প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত, একটি ব্যঙ্গাত্মক বাংলা গ্রন্থ ‘উনবিংশ পুরাণ’-এ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ছদ্মনামে এটি প্রকাশিত হলেও তৎকালীন সময়ের বিশিষ্ট চিন্তক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই যে এর লেখক তা বিভিন্ন সূত্র মারফত বোঝা যায়।

এই সময় বঙ্গের সাহিত্য-আসরে বঙ্কিমচন্দ্রের আগমন বাঙ্গালি তথা ভারতবাসীর মনে হিন্দুত্ব তথা জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ভিত তৈরি করে দিয়েছিল। চার্লস হেইমস্যাথ তাঁর ‘দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম অ্যান্ড হিন্দু সোশ্যাল রিফর্ম’ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কৃতির মধ্যেই চরমপন্থী রাজনীতির উৎস লুকিয়ে রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে, বিদেশ থেকে আমদানি করা কোনো তত্ত্ব নয়, এ দেশের আবহাওয়া, মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যই তার মূলগত ভিত্তি হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনা কীভাবে হিন্দুত্ববোধী চেতনার রঙে

জারিত হয়ে জাতীয়তাবোধের আদর্শগত ভিত্তি স্থাপন করেছিল, তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হবার পর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় শ্রীকৃষ্ণই হয়ে ওঠেন হিন্দুমাত্রেরই আদর্শপুরুষ। বঙ্কিমের কৃষ্ণ হলেন গীতার শ্রীকৃষ্ণ। যিনি বলেন :

“যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

পরিব্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে।।”

এই শ্রীকৃষ্ণ নিলিপ্ত ঈশ্বর নন। তিনি ধর্ম সংস্থাপনের জন্য দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালনের কাজে সদা জাগ্রত। শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁর অতুলনীয় নেতৃত্ব দানের প্রতিভা এবং সামরিক জ্ঞান ও রাষ্ট্র-সংগঠনী কুশলতার ওপর। শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্ন দেখেছিলেন এক ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের, আর এই স্বপ্নকে পূরণ করার জন্যই কুরুক্ষেত্রে অগণিত ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের বিলোপ ঘটিয়ে এক সুবিশাল, সংহত ধর্মরাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হবার পর তা সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের স্ফূরণ ঘটায়। তিলক রচনা করলেন গীতার মরাঠি ভাষা। অরবিন্দ লিখলেন গীতার দীর্ঘ ভূমিকা। লাজপত রায় উর্দু ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনী প্রণয়ন করলেন। ভক্তিব্যোমের ব্যাখ্যা লিখলেন অশ্বিনী কুমার দত্ত। বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীকৃষ্ণকে ‘ভারত-আত্মা’ হিসাবে অভিহিত করলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখলেন— ‘শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব’। এমনই ছিল বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব।

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘ধর্মতত্ত্ব’ (অনুশীলন) গ্রন্থের আদর্শে এবং এর নাম অনুসারে বঙ্গের সবথেকে খ্যাতনামা বিপ্লবী দল ‘অনুশীলন সমিতি’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০২ সালে। অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট বিপ্লবী জীবনতারা হালদার তাঁর ‘অনুশীলন সমিতির ইতিহাস’ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, ‘বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমাধিত আদর্শ মানব গঠনের যে নির্দেশ আছে তাহাই হইল অনুশীলন সমিতির ভিত্তি।’

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ ও তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বন্দেমাতরম্ ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিকাশে বিরাট অবদান রেখেছিল। ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে ভবানন্দ সর্বপ্রথম মহেন্দ্রকে ‘বন্দে মাতরম্’ গেয়ে শোনান। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় আনন্দমঠ লেখা হয়েছিল। দেশকে দেশমাতৃকা রূপে দেখানো এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সবথেকে বড়ো কৃতিত্ব।

প্রসঙ্গত, ১৮৭০ দশকের শেষার্ধ্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘বন্দে মাতরম্’ লিখলেন। এই গানটি ১৮৮২ সালে প্রকাশিত তাঁর যুগান্তকারী সাহিত্যকর্ম ‘আনন্দমঠ’-এর অংশ হয়ে যায়। ‘আনন্দমঠ’ তার সাহিত্যমূল্য ও সামাজিক প্রভাবের কারণে যুগান্তকারী হয়েছে। পরবর্তীকালে অনেকে ‘আনন্দমঠ’কে মুসলমান-বিদ্বেষী প্রতিপন্ন করে ভারতীয়দের জাতীয় জীবনে বন্দেমাতরমের গুরুত্ব লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের এই অপলাপের

প্রতিবাদ খেদ মুসলমান সমাজের ভিতর থেকেই উঠে এসেছে।

বিশেষ করে, দেশভাগের সময় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় মুসলিম লিগের প্ররোচনায় কলকাতার রাস্তায় শত শত কপি ‘আনন্দমঠ’ পোড়ানোর প্রতিবাদ করে বিশিষ্ট মুসলমান-চিন্তক রেজাউল করীম লেখেন, ‘আনন্দমঠকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ইহারা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন তাহা অতীব জঘন্য। স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য এই যে প্রচেষ্টা, ইহা ইসলামকে উদ্ধার করিবে না। ইহা লইয়া যাইবে মুসলমানকে অধঃপতনের দিকে।..... ভুলুপ্তিত হইল মুসলমানের স্বাধীন চিন্তার শক্তি....।’ আনন্দমঠ প্রসঙ্গে রেজাউল করিমের মনোভাব, ‘আজ আনন্দমঠের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যে নহে। তাহার মূল কারণ মুসলমান যাহাতে মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে না পারে তাহার জন্য কতকগুলি ছল বাহির করিবার দুর্বিসন্ধি।’ বন্দেমাতরম প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘অন্যান্য দেশের মুসলমানরা এরূপ গান ব্যবহার করিবার মতো পরিস্থিতি পাইলে ধন্য হইয়া যাইতেন’। তাই তাঁর মতে, বঙ্কিমের নিকট যদি বাঙ্গালি ঋণী হয়, বাংলাভাষা ঋণী হয়, তবে বাঙ্গালি মুসলমানও সমভাবে তাঁহার নিকট ঋণী, সর্বাংশে ঋণী।

রেজাউল আবদুল করীমের ‘বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ’ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার। সেখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দেমাতরমকে ইসলামবিরোধী সাজানোর মুসলিম লিগের চক্রান্তের বিরোধিতা করেছেন।

ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন, ‘বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী কখনোই সং মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেনি। তাঁর রচনায় নিন্দিত হয়েছিলেন কেবলমাত্র অত্যাচারী বা অপদার্থ মুসলমান শাসকবর্গ। তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা চলত যদি তিনি আকবর বা হুসেন শাহের মতো কোনো সুশাসকের কুৎসা করতেন।

একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক হলেও ইতিহাসের গুণাগ্রাহী ছিলেন। তিনি সাহিত্যকে আশ্রয় করে দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশঅস্মিতা জাগাতে আগ্রহী হলেও তার ঐতিহাসিকতাকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৮৮২ সালে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান শাসকদের ইতিহাসকে বাঙ্গলার ইতিহাসের অংশ বলে মেনে নিতে তাই অস্বীকার করেন। তিনি লিখেছিলেন : ‘আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদশাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়া, নিরুদ্ধেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম-মৃত্যু, গৃহবিবাদ এবং খিচুড়িভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধও নাই। বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙ্গালি এ সকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালি নয়। আত্মজাতিগৌরবান্বিত, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী

মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালি নয়।”

তিনি এই প্রবন্ধেই বাঙ্গলার নির্মোহ ইতিহাস খুঁজে তা লেখার জন্য বাঙ্গালিদের প্রতি আহ্বান জানান। বাঙ্গালি নামের দ্বারা তিনি আসলে বাংলাভাষাভাষী হিন্দুদেরই চিহ্নিত করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন, সঠিক ইতিহাস-জ্ঞান একটি জাতির উত্থানের জন্য আবশ্যিক। আর মিথ্যা, বিকৃত ইতিহাস যে একটি জাতিকে ভেতর থেকে ফাঁপা করে দিতে পারে তাও তিনি বুঝেছিলেন। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধে ইউরোপে যখন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-চর্চার শৈশবাবস্থা এবং বঙ্গে যখন ইতিহাসচর্চা প্রায় শূন্যই হয়নি বলা চলে, সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনা ও ইতিহাস লেখনীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মিনহাজ উদ্দিনের ‘তবকাত-ই-নাসিরী’-তে প্রাপ্ত বখতিয়ার খিলজির সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গবিজয়ের কাহিনিকে কোনদিনই বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেছিলেন, ‘সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।’ তিনি এই ঘটনাকে অসম্ভব বলে মনে করেন এবং বখতিয়ার যে বঙ্গের খুব কম অংশকেই দখল করতে পেরেছিলেন, তাও উল্লেখ করেন। আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণায় বঙ্কিমের দাবি যে ঐতিহাসিকভাবে সত্য তা উঠে এসেছে। বখতিয়ার শুধু কয়েক বছরের জন্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ দখলে রাখতে পেরেছিলেন। বাকি উভয় বঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলই লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন, কেশব সেন-সহ তাঁর উত্তরাধিকারীরা বহুবছর যাবৎ শাসন করেন। মৃগালিনী উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র বখতিয়ার-সংক্রান্ত কিংবদন্তীটির বিরোধিতা করেছেন।

আনন্দমঠ উপন্যাসে দেখা যায়, ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বিভিন্ন যুগে দেশমাতৃকার নানা রূপ দেখাচ্ছেন। প্রথমে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে দেখাচ্ছেন, এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্ন, সর্বাঙ্গবরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী



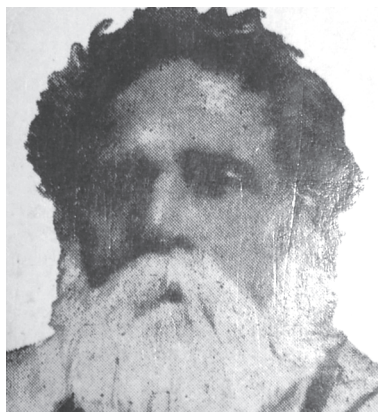
বিশ্বিন্দ্র চন্দ্র পাল



নবগোপাল মিত্র



চন্দ্রনাথ বসু



রজনীকান্ত বসু

মূর্তি। মহেন্দ্র তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ বললেন, ‘মা যা ছিলেন’। তারপর ব্রহ্মচারী কক্ষান্তরে মহেন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন মা কালীর মূর্তি। বললেন দেখ, মা যা হইয়াছেন। কালী-অঙ্ককারসমাচ্ছন্ন, কালিমাময়ী। হতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্রই শ্মশান তাই মা কঙ্কালমালিনী।’ তারপর ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে দেখালেন মন্মথের প্রস্তর নির্মিত একটি মন্দিরের মধ্যে সোনার তৈরি দশভুজা দুর্গা-প্রতিমা। ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে বললেন, ‘এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত, দিগভুজা, নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুবিমর্দিনী বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী-বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।’ মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, মায়ের এই মূর্তি কবে দেখতে পাব? উত্তরে ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ বললেন, ‘যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন তিনি প্রসন্ন হইবেন।’

এখানে বিভিন্ন দেবীমূর্তির কথা বলে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা বোঝাতে চেয়েছেন। প্রথমে স্বর্ণালংকারভূষিতা জগদ্ধাত্রী হচ্ছেন প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষের প্রতীক। তারপর নগ্নিকা, হতসর্বস্বা, শ্মশানচারিণী মা কালী মুসলিম ও ব্রিটিশ আমলে অত্যাচারিতা, লুণ্ঠিতা, পরাধীন দেশমাতৃকার প্রতীক। এরপর লক্ষ্মী-সরস্বতী-গণেশ-কার্তিক সহ স্বর্ণনির্মিত দশভুজা দুর্গামূর্তির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতবর্ষের এক প্রতিচ্ছবি অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন সাহিত্য-সম্রাট।

ঋষি অরবিন্দের কথায় ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি এক নতুন ধর্মের জন্ম দিল, যা হলো দেশপ্রেমের ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ‘একদিন দেখিবে এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।’ বাস্তবে হয়েছিলও তাই। ১৯০৫ থেকেই

সুৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বসাকৈৰ
অত্যাধুনিক গয়নাৰ
ডিজাইনের ক্যাটালগ

সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....

Vandana®

SAREES • SUITS • BEDSHEETS

Mfg. of Cotton Printed & Embroidery
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার
প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে,
তারা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে NEFT-র মাধ্যমে
সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের
শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।
স্বস্তিকার প্রচ্ছদে QR code ছাপানো
হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে
পারেন।



টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই
জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৮,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৮

Account Name :
**SUBHSWASTIKA PRINTS
FOUNDATION**

A/C. No. : 103502000100693

IFSC Code : IOBA0001035

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : Sreemani Market

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা
করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা
(মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক
তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা)
পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৮

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২
সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের
কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য
হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার)
টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের
কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি
ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম :-

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints
Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন।
টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার
সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা
নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

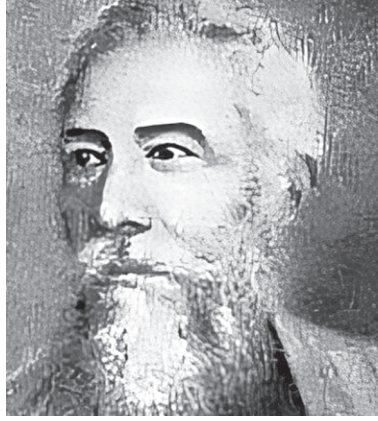
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

স্বস্তিকা - পূজা সংখ্যা।। ১৪৩২।। ১২৬

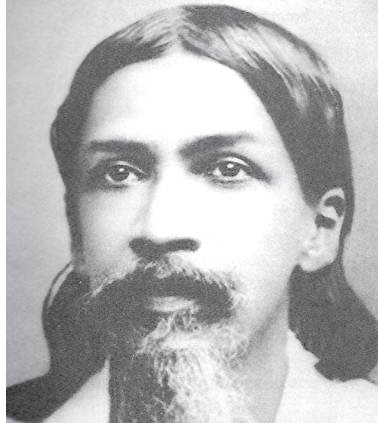
বঙ্গসমেত সারা ভারতবর্ষে ‘বন্দেমাতরম’ দেশপ্রেমের মন্ত্র, জাতীয়তাবোধের ও স্বাধৈশিকতার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। অনুশীলন সমিতির আদর্শের অন্যতম উৎসও হয়ে দাঁড়ায় ‘আনন্দমঠ’ ও ‘বন্দেমাতরম’। আনন্দমঠ হিন্দু জাতীয়তাবোধ, মুসলমানদের সঙ্গে নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনেনি। বইটির প্রথম সংস্করণ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের লড়াই থেকে মুসলমানদের একেবারেই বাদ দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে যদিও শত্রু গোরা, ব্রিটিশ ও সেনা থেকে পরিবর্তিত হয়ে ‘নেড়ে’ ও ‘যবন’ হয়ে যায়। এই দুই শব্দ মূলত বাংলার মুসলমানদেরকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতো।

বাংলাদেশের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী আহমদ ছফা’র মতে, বঙ্কিমের মতন আর কেউ বাঙ্গলার সমাজ ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করেননি। ফ্রান্সে রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের যে প্রভাব তার সঙ্গে কেবল তুলনা করা যেতে পারে বঙ্গের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে আনন্দমঠের প্রভাব। ‘শতবর্ষের ফেরারি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ গ্রন্থে বঙ্কিমের সাহিত্যমানকে স্বীকার করে নিয়ে ছফা জোর দেন যে, বঙ্কিমের রাষ্ট্রচিন্তা তাঁকে একটা স্বতন্ত্র জায়গা করে দিয়েছে। ছফা বলেন, ‘বঙ্কিম ক্ষমতাবান লেখকের চেয়েও অধিক কিছু ছিলেন।’ এও বলেন যে, ‘তিনি সর্বপ্রথম একটি হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন।’

আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে চরমপন্থার উদ্ভবেও বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান ছিল। কংগ্রেসের নরমপন্থীদের নীতি ও কর্মপন্থার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্রই চরমপন্থার উত্থানের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। কমলাকান্তের দপ্তরে ‘পলিটিকস্’ রচনায় তিনি কমলাকান্তের মুখ দিয়ে নরমপন্থীদের সমালোচনা করে বলেছিলেন, “জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো! ইহাই আমাদের পলিটিকস্।” তিনি এই প্রবন্ধে কলুর পুত্র সংক্রান্ত একটি গল্পে নরমপন্থীদের রাজনীতিকে কুকুর জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে তুলনা করেন এবং এর পরিবর্তে ‘বৃষ জাতীয় রাজনীতি’ গ্রহণ করার কথা বলেন।



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর



ঋষি জয়কিন্দ



বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



স্বামী বিবেকানন্দ

এহেন বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি শুধু সাহিত্যসম্রাট এবং বাংলা সাহিত্যের ভগীরথই নন, তাঁর রচনার সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। বঙ্গ তথা ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উত্থানের পিছনে তাঁর রচনাগুলি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এইভাবে উনিশ শতকের মধ্যভাগ ও তার পরবর্তীসময়ে মূলত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখের সহযোগিতায় যখন বাঙ্গালির মনে হিন্দুত্বের চেতনা জাগ্রত করছেন, তখন এরই সূত্রে বাঙ্গালির সামনে হিন্দুত্বের ক্রিয়াকলাপ চালানোর পথও ক্রমে প্রশস্ত হচ্ছিল। সৌজন্যে রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলার আয়োজন।

দেশাত্মবোধ এবং হিন্দু জাতীয়তাবোধী চিন্তায় আগাগোড়া নিমজ্জিত রাজনারায়ণ বসু ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে ‘জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা’ এবং বেশ কয়েক বছর পরে কলকাতায় সঞ্জীবনী সভা নামে দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, হিন্দুত্বের চেতনার উন্মেষে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। রাজনারায়ণ তাঁর ‘আত্মচরিতে’ উল্লেখ করেছেন, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার কার্যবিবরণী থেকে নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা আয়োজন করার অনুপ্রেরণা পান। বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে রাজনারায়ণ তাঁর শ্রোতাদের অনেককেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজনারায়ণের অন্যতম কৃতিত্ব তাঁর ‘হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা’ নামক বক্তৃতায়, তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। সেই বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। বাঙ্গলার ছোটলাট লিটনের দেশীয় ভাষা সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি অগ্রগণ্য ভূমিকাও গ্রহণ করেন।

১৮৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাজনারায়ণ ‘বৃদ্ধ হিন্দুর আশা’ নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে



থাকে যদি
ডাটা,
জমে যায়
রান্নাটা

১১১ ১১১ ১১১ ১১১ ১১১ ১১১ ১১১ ১১১ ১১১ ১১১ ১১১ ১১১ ১১১ ১১১

শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ
**কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকুমী)
প্রাইভেট লিমিটেড**



207 Maharshi Debendra Road, Kolkata 700007
Email : dutaspice@gmail.com, Website : www.dutaspices.com
Facebook : www.facebook.com/duta.rannaghar
Youtube : www.youtube.com/c/duta.rannagharbengalirecipe
For trade enquiry, call 98366 72200
/ 033 2259 4112 / 98363 74300

কিনার সময় অবশ্যই 'কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকুমী) প্রাইভেট লিমিটেড'
নাম দেখে তবেই কিনাবেন

স্বাদে আর সাথে, আছাদে... **ডাটা**

তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুদের একত্রিত করে একটি সংগঠনের অধীনে আনার আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় এই প্রতিষ্ঠান গঠিত না হলেও, হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা তাঁর মৃত্যুর পরে মোটামুটি একই উদ্দেশ্য নিয়ে, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মহাসভা স্থাপন করেছিলেন।

বাঙ্গলায় যে সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল ‘হিন্দুমেলা’। রাজনারায়ণ বসুর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে চৈত্রসংক্রান্তির দিন কলকাতায় ‘হিন্দুমেলা’-র প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু মেলার প্রাণপুরুষ ছিলেন নবগোপাল মিত্র এবং বিশিষ্ট সহযোগী ছিলেন ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা, যেমন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, এছাড়াও ছিলেন মনোমোহন বসু। হিন্দুমেলার সদস্যদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রমানাথ ঠাকুর, পিয়ারিচরণ সরকার, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ হিন্দুসমাজের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘বাল্যকথা’য় লিখেছেন—

‘কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোনো একটি উদ্যানে বৎসরে তিন-চার দিন ধরে এই মেলা চলত। সেখানে দেশি জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সংগীত, বক্তৃতা ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা হত।’

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার হিন্দুমেলার তিনটি উদ্দেশ্য ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হলো—(এক) জাতীয় ভাবের প্রসার ঘটানো। (দুই) দেশাত্মবোধ সৃষ্টি করা, এবং (তিন) হিন্দুদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতার মনোভাব গঠন করা। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, ‘আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোনো বিষয় সুখের জন্য নহে, কোনো আমোদপ্রমোদের জন্যও নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারত ভূমির জন্য।’ মেলার দ্বিতীয় বর্ষে মনোমোহন বসু প্রদত্ত বক্তৃতায় উল্লেখ করা হয়েছে ‘...কিন্তু এই চৈত্র মেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নাম গন্ধমাত্র নাই এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে তাহাও স্বদেশীয় জনগণের হস্ত সত্ত্বত স্বজাতির উন্নতি সাধন, ঐক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।’

গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল ‘হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত’ রচনায় মেলার প্রথম অধিবেশনের এক বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ থেকে জানা যায়, হিন্দু মেলার উদ্দেশ্যপূরণের জন্য ছয়টি কমিটি গঠিত হয়। প্রথম কমিটির কাজ ছিল হিন্দুদের মধ্যকার বিদ্বেষভাব দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় কমিটির কাজ ছিল এক বছরে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণী তৈরি করা। তৃতীয় কমিটির কাজ ছিল দেশীয় বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি ও প্রসারে নিয়োজিত স্বদেশিদের সম্মান জানানো। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কমিটিগুলির কাজ ছিল দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে শিল্পজাত পণ্য সংগ্রহ করে সেগুলি মেলায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

জাতীয়তার আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলিকে জনসমক্ষে প্রচার করার জন্য নবগোপাল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌরোহিত্যে ‘ন্যাশনাল পেপার’ নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এই পত্রিকার ছাপাখানার নাম দেওয়া হয় ‘ন্যাশনাল প্রেস’। দ্বিতীয় বছরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘মিলে সবে ভারত সন্তান / একতান মন প্রাণ, গাও ভারতের যশোগান’ পরিবেশন করা হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নবগোপাল মিত্রের অনুরোধে জীবনের প্রথম কবিতা ‘জন্মভূমি জননী, স্বর্গের গরীয়সী। / জাগ জাগ ভারতসন্তান’ পাঠ করেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারি পার্শ্ববাগানে অনুষ্ঠিত হিন্দু মেলার নবম অধিবেশনে চতুর্দশীয় বালক রবীন্দ্রনাথ ‘হিন্দু মেলার উপহার’ নামে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ‘হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র’ প্রবন্ধে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

‘তখনও অস্ত্র আইন লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং বন্দুক ছোঁড়া বা তরোয়াল খেলা অভ্যাস করা কঠিন ছিল না। ধাপার মাঠে যাইয়া হিন্দু মেলার বিশিষ্ট কর্মকর্তারা পাখি শিকারের ভান করিয়া বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতেন’।

হিন্দু মেলার চতুর্থ অধিবেশনের পর নবগোপাল মিত্র ‘ন্যাশনাল সোসাইটি’ বা ‘জাতীয় সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় সভার মাসিক অধিবেশনগুলিতে দেশবাসীর হিতসাধন মূলক শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা হতো।

রেনেসাঁসের কালজুড়ে বঙ্গে হিন্দুত্বের হাওয়া বইলেও ‘হিন্দুত্ব’ শব্দের লিখিত প্রয়োগ দেখা যায় উনিশ শতকের একেবারে শেষপ্রান্তে। চন্দ্রনাথ বসুর বই ‘হিন্দুত্ব’ ১৮৯২ সালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ছাপার হরফে হিন্দুত্ব শব্দ ব্যবহারের প্রথম নজির এই বইয়েই পাওয়া যায়। ‘কলকাতা রিভিউ’ জুলাই, ১৮৯৪-এর সংখ্যাতে আড়াই পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনা করা হয়। চন্দ্রনাথ তাঁর ‘হিন্দুত্ব’ প্রবন্ধে হিন্দুর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দু কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়—এই অভিমত তিনি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন। সাধারণভাবে ভারতে ‘হিন্দুত্ব’ শব্দটির অস্তিত্ব হিসেবে সাভারকারকেই কৃতিত্ব দেওয়া হয়। যদিও এই কৃতিত্বের সম্পূর্ণ দাবিদার এক বাঙ্গালি, তাঁর নাম চন্দ্রনাথ বসু। উত্তর ভারতের সুচতুর একদল মানুষ বঙ্গপ্রদেশকে ধর্মনিরপেক্ষতার আবাসভূমি ও মহারাষ্ট্রকে হিন্দুত্বের বিচরণভূমি হিসেবে চিত্রিত করে থাকেন। অথচ হিন্দুত্বের সৃষ্টি ও আবাসভূমি যে এই বঙ্গ, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। সাভারকার ‘হিন্দুত্ব’ গ্রন্থটি লেখেন ১৯২৩ সালে, অথচ চন্দ্রনাথ বসু প্রায় ৩১ বছর আগে (১৮৯২) তাঁর ‘হিন্দুত্ব’ গ্রন্থটি রচনা করেন। যদিও সাভারকার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়ায় এবং ইংরেজি ভাষায় তাঁর গ্রন্থটি লিখিত হওয়ায় সর্বভারতীয় স্তরে বেশি করে তা প্রচারের আলোয় এসে পড়ে। রেনেসাঁসের বঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ছিলেন এর উদ্ভাতা। হিন্দু জাতীয়তাবোধী হলেও তিনি হিন্দুধর্মকে সংস্কারের উর্ধ্বে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। ভূদেব

মুখোপাধ্যায়ের মতো তিনি উদার দৃষ্টি নিয়ে ধর্মকে দেখেছেন। দেশের সকল মানুষকে উদার হিন্দুত্বের পতাকাতে সমবেত হতে চেয়েছেন। এখানেই তাঁর জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য নিহিত।

চন্দ্রনাথ বসু উনিশ শতকের রেনেসাঁসের আলোয় স্নাত হয়েও পাশ্চাত্যের অনুকরণের স্রোতে গা না ভাসিয়ে বিপরীত স্রোতের যাত্রী হয়েছিলেন। নিজের ধর্ম ও ঐতিহ্যের দিকে ফিরে তাকালেন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। এক তীব্র জাতীয়তাবোধ তাঁকে পরিচালিত করলো। তাঁর সৃষ্টি বিশ্বে সেই জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। তাঁর মধ্যে এই জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠার মূলে আছে শশধর তর্কচূড়ামণির প্রভাব। উনিশ শতকের হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের অন্যতম এই নেতার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ছাত্রজীবন থেকেই চন্দ্রনাথের মানস-সংকট চলছিল। একসময় দার্শনিক কৌতের পজিটিভিজম তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কৌতের মতবাদে ঈশ্বরের স্থান নেই দেখে তাঁর অন্তরে অতৃপ্তি থেকে যায়। একসময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু ধর্মের প্রতি বিশ্বাস কিছুটা শিথিল হয়েছিল চন্দ্রনাথের। দীর্ঘদিনের সেই অতৃপ্তির অব্যবহিত এক মুহূর্তে চূড়ামণি মহাশয়ের সাক্ষাৎকারে দূরীভূত হল। ‘ধৃ’ ধাতু থেকে ধর্ম, অর্থাৎ যা ধারণ করে তাই ধর্ম। বিশ্বে যা কিছু আছে তা বিশ্বনাথ থেকে স্বতন্ত্র রাখলে বিশ্বনাথকে পাওয়া যায় না। কারণ বিশ্ব তাহলে আমাদেরকে রক্ষা না করে বিনাশই করে। এই তত্ত্বের আলো চন্দ্রনাথ বসুর জীবনকে এক অন্য খাতে প্রবাহিত করে। তাঁর কাছে ধর্ম ও দেশ এক ও অভিন্ন হিসেবে প্রতিভাত হয়। এই সময় থেকেই চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে ব্রতী হন। চন্দ্রনাথ সম্পর্কে সমালোচক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: ‘যারা শিক্ষা অর্জন করে হিন্দু ও হিন্দুত্বকে কেবল ঘৃণা করতে শিখেছে, তাদের মনে ঘৃণার পরিবর্তে অনুরাগ সঞ্চার করে দেওয়া এবং যারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছে তাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় ঘটানো ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এমনকী শিথিল সমাজ বন্ধনকে তিনি দৃঢ় করতেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। সমাজ বন্ধন সুদৃঢ় করা তথা হিন্দুজাতির ঐক্য সাধনের প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে চন্দ্রনাথ বসুর জাতীয়তাবোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর এই ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবোধের স্বরূপ মূলত ‘শকুন্তলাতত্ত্ব’ (১৮৮১), ‘হিন্দুত্ব’ (১৮৯২) ও ‘সাবিত্রী তত্ত্ব’ (১৯০০) নামক গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। ‘শকুন্তলাতত্ত্ব’ বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে সাতটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কালিদাসের নাট্যকাব্য ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম’ বিশ্লেষণ করে চন্দ্রনাথ কয়েকটি সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন। যার মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করা এবং এক সামগ্রিক চেতনায় সম্মিলিত হওয়া, যা জাতীয়তাবোধেরই নামান্তর।

চন্দ্রনাথ বসু সমালোচনামূলক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যদি ‘শকুন্তলাতত্ত্ব’ হয় তাহলে সমাজতত্ত্বমূলক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ‘হিন্দুত্ব’ নামক গ্রন্থ। ‘বঙ্গালির ইতিহাস না থাকলে বঙ্গালি মানুষ

হবে না’ বঙ্কিমচন্দ্রের এমনই আশ্কেষের জবাব পাওয়া যায় ‘হিন্দুত্ব’ (১৮৯২) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় — ‘ইউরোপ যাহাকে ইতিহাস বলে আমাদের তাহা নাই সত্য, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ আমাদের পূর্ণমাত্রায় আছে।’ জাতির প্রকৃত ইতিহাস সন্ধানের লক্ষ্যেই চন্দ্রনাথ ‘হিন্দুত্ব’ নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, দেবতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজপ্রণালী ইত্যাদি বহু বিষয়কে একত্রিত করে ‘হিন্দুত্ব’-কে আকার দিতে চেয়েছেন। এই সমস্ত কিছুর জন্য হিন্দু কারও কাছে বিন্দুমাত্র ঋণী নয় বরং হিন্দুর যা আছে সবই তার নিজস্ব। প্রাচীন বৈভবের গর্ব করা মনুষ্যত্ব নয়, প্রাচীন বৈভব পুনর্লাভ করাই মনুষ্যত্ব—এই ধারণার পূর্ণ প্রতিফলন ‘হিন্দুত্ব’-তে লক্ষ্য করা যায়। ‘হিন্দুত্ব’ গ্রন্থে চন্দ্রনাথ মূলত অদ্বৈতবৈদান্ততত্ত্ব এবং কতগুলি মৌলিক বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। বিষয়গুলি হলো—সোহহং, লয়, নিকাম ধর্ম, তুযানল, কড়াক্রান্তি, পুত্র, আহার, ব্রহ্মচর্য, বিবাহ, তেত্রিশ কোটি দেবতা, মূর্তিপূজা, মৈত্রী। চন্দ্রনাথের ‘হিন্দুত্ব’ গ্রন্থের প্রকাশ একটি বিষয় স্পষ্ট করে, যে হিন্দু জাতীয়তাবোধ এদেশে মাথা তুলেছে তার গর্ভগৃহ আসলে এই বঙ্গপ্রদেশ। এমনকী সুমিত সরকারের মতো জাতীয়তা-বিরোধী বামপন্থী ইতিহাসবিদও তাঁর ‘বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৮)’ গ্রন্থে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন :

‘....দেখা গেলো, বাঙালি ভদ্রলোকের জাগ্রত জাতীয় গর্ব প্রাচীন হিন্দুর গৌরব ও মধ্যযুগে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিরোধের চিত্রের মধ্যে শক্তি খুঁজে নিলো।..... দেশপ্রেমকে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের সাথে মিলিয়ে চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখা গেলো। ‘হিন্দু’ ও ‘জাতীয়’ সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকলো।’

উনিশ শতক জুড়ে হিন্দুত্বের যে ধারাটি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত হচ্ছিল, তার উৎকৃষ্টতম বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেল উনিশ শতকে শেষ দশকে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণের মাধ্যমে। বস্তুত, স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রা একদিকে যেমন হিন্দুত্বের বিজয়কেতন উড়িয়েছিল, তেমনই হিন্দুত্বই যে খাঁটি ভারতীয়ত্ব, তাকেও সুস্পষ্টভাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিল। শিকাগো বক্তৃতায় স্বামীজী হিন্দুদের উদারনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক, গোঁড়ামিমুক্ত চিন্তাধারা তুলে ধরে প্রথমে আমেরিকা, পরে ইউরোপ জুড়ে বিশ্বমানবতার জয়গান গেয়েছিলেন। সারা বিশ্ব সেদিন অনুধাবন করতে পেরেছিল, ভারতবর্ষ তথা হিন্দুদের ধর্মীয় দর্শন কোন উচ্চাসনে আসীন। এর মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ একদিকে যেমন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতবাদকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন, যা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন নামে আজ বঙ্গের ঘরে ঘরে পরিচিত; অন্যদিকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কালপর্বে হিন্দুত্বের চেতনাকে আপামর বাঙ্গালির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তা বাঙ্গালি আজও বহন কে চলেছে।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আজও মূলত কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকরা হিন্দু ও জাতীয় শব্দকে আলাদা করে ঐতিহাসিকতাকেই অস্বীকার করতে চান।